নেপালে বঙ্গনারী।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত

প্রকাশক,
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা
১৩:৮।

মূল্য—১৲ টাকা।

ভূমিকা।

হিমালয় যে পয়োধি-বেষ্টিত বিপুল দেশের শিরোভূষণ তাহা জগতে হিন্দুস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এই হিন্দুস্থানবাসী হিন্দুদিগের সহিত পৃথিবীর আর কোন জাতিরই সাদৃশ্য কিম্বা জ্ঞাতিবন্ধন নাই। দুর্ভেদ্য নৈসর্গিক পরিখা ও প্রাকারে বেষ্টিত করিয়া বিধাতা যেন ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে স্বতন্ত্র এবং চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই জাতির প্রাচীন ইতিহাস এবং মহত্ত্ব জগতে সর্ব্বজনবিদিত, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সেই আদিম সুসভ্য পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দু জাতি আজ পরপদানত ও হীনবীর্য্য বলিয়া বর্ত্তমান সুসভ্য জাতি সকলের কৃপাপাত্র হইয়াছে। কেবল দুইটী মাত্র রাজ্য এখনও পর্য্যন্ত স্বাধীনতার গৌরবময় উজ্জ্বল টীকা ললাটে ধারণ করিতেছে। তন্মধ্যে নেপাল প্রধান। ইহা হিমালয়ের ক্রোড়স্থ বিস্তীর্ণ প্রদেশ, প্রকৃতির রম্য কানন, বিবিধ নৈসর্গিক শোভা এবং সম্পদে সৌভাগ্যবান। ইহার উত্তরে চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের শিখরমালা, তাহার চরণে গভীর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী। হিমাচল নরের অগম্য, পুরাণে ইহা দেবের আবাসস্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বিধাতা নেপাল রাজ্যকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়াছেন, তাই ইহা আজও স্বাধীন। জগতবাসীর কথা দূরে থাকুক, এদেশ ভারতবাসীরও অজ্ঞাত। এ রাজ্য অতি বিচিত্র, ইহার প্রাচীন ইতিহাস অপূর্ব্ব

উপন্যাসের ন্যায়। এই লুক্কায়িত স্থানে অনেক প্রাচীন কথা গুপ্ত আছে। সুদূর চীন হইতে কোন্ যুগে কোন্ বোধিসত্ত্ব মহাত্মা আসিয়া কোন্ বিপুল হ্রদকে রমণীয় উপত্যকায় পরিণত করিয়াছিলেন, কোথায় সেই হ্রদের মধ্যে শতদল শোভা পাইল, শতদলের নিম্নে পবিত্র বারি উৎসারিত হইল, সেখানে স্বয়ম্ভু ভগবান দিব্য কিরণে প্রকাশিত হইলেন, অদ্যাবধি নেপালবাসী ও নানা স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া তথায় পশুপতিনাথকে দর্শন করেন। কোথায় কোন দেবতার হস্তস্পর্শে দৈব বারিধারা উৎসারিত হইয়া নির্ঝরিণী সৃষ্টি করিয়াছে—কি অপূর্ব্ব কথা সে সকল! যুগে যুগে কত মহাপ্রাণ হিন্দু, মুসলমানদিগের ভয়ে ভীত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া এই দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন, হিন্দুস্থান হইতে হিন্দু ধর্ম্ম উৎপীড়িত হইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ভারত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের জন্মস্থান, এই উভয় ধর্ম্মই নেপালে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এক্ষণে এই উভয় ধর্ম্মই নেপালের জনসাধারণের ধর্ম্ম। ভারতের সর্ব্বত্রই রেলপথ বিস্তৃত হওয়াতে কোন প্রদেশই আর ভ্রমণকারীর অজ্ঞাত নাই। কিন্তু নেপাল রাজ্য সকলের নিকটেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দেশ হইয়া রহিয়াছে। নেপালে অবস্থান কালে আমি নেপাল সম্বন্ধে "প্রবাসীতে" কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকেই কৌতূহলী হইয়া আমাকে নেপাল সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিতেন। সেই হেতু আমার এই পুস্তকখানির জন্ম। আমি ডাক্তার ওলডফিলড, (Oldfield) রাইট, হাউট, হডসন, প্রভৃতির পুস্তকে নেপালের

বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। নেপালের ইতিহাস তাঁহাদিগের পুস্তক হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। পাঠকপাঠিকাগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ কিছু লাভ করিবেন বলিয়া আমি আশা দিতে পারিতেছি না। যদি কেহ কিছু লাভ করেন, তবে আমার আর আনন্দের সীমা থাকিবে না।

৯ই মার্চ্চ, ১৯১২ গ্রন্থকর্ত্রী।

সূচী পত্র।

প্রথম পর্য্যায়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়।

চিত্রের সূচী

প্রথম পর্য্যায়

নেপালের প্রধান রাজমন্ত্রী মহারাজ সার চন্দ্রশামসের
জঙ্গ রাণা বাহাদুর।

নেপালে বঙ্গনারী

নেপাল যাত্রা।

আমরা সত্য সত্যই নেপাল রাজ্যের রাজধানী কাটমণ্ডুতে অবস্থান করিতেছি। সম্মুখে ভুবনবিখ্যাত এভারেষ্টের শুভ্র হিমানীমণ্ডিত শিখর রৌদ্রে চক্ চক্ করিতেছে। তাহার উভয় পার্শ্বেই সীমান্ত ব্যাপিয়া চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতমালা। এই আমাদের ভারতের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত। কে ইহার নাম হিমালয় রাখিয়াছিল? ইহা যে প্রকৃতই হিমালয়। আহা! ঐ শুভ্র নির্ম্মল হিমালয়ে প্রাণ ছুটিয়া যায়। কিন্তু উহা মানবের অলঙ্ঘনীয়। এই সেই কাটমণ্ডু! বাল্যকালে ভূগোলে পড়িয়াছিলাম নেপাল হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত স্বাধীন রাজ্য, কাটমণ্ডু তাহার রাজধানী। তখন কাটমণ্ডু পড়িলেই শিহরিয়া উঠিতাম। কাটামণ্ডুতে গেলে বুঝি কেহ আর মুণ্ড ফিরিয়া পায়না। না জানি সে কি ভীষণ রাজ্য! সে দেশের মানব বুঝি সাক্ষাৎ দানব। ক্রমে শুনিলাম নেপালে গিয়া লোকে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেবল শ্রুত কথা নয়, নেপাল প্রত্যাবৃত্ত সাক্ষাৎ মানব দেখিলাম, কৈ মুণ্ডত

যায় নাই, বরং কিছু লাভ হইয়াছে। তখন কাটমণ্ডুভীতি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। কিন্তু তখনও ভাবি নাই যে সেই কাটমণ্ডুতে এক দিন আসিতে হইবে।

জুলাই মাসের এক দিন রাত্রি প্রায় ১০টার সময় হাবড়া হইতে রেলগাড়ী চড়িয়া নেপাল যাত্রা করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে মোকামা ঘাটে পৌছিলাম। ষ্টীমারে করিয়া গঙ্গা পার হইবার সময় গঙ্গার বক্ষে অরুণোদয় দেখিলাম। সে বড় সুন্দর দৃশ্য। গঙ্গা পার হইয়াই পুনরায় রেল গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মজঃফরপুর, মতিহারী ইত্যাদি ছাড়িয়া বৈকালে শিগাউলি পৌছিলাম। এই সেই শিগাউলি, যেখানে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজের সহিত নেপাল রাজের সন্ধি হইয়াছিল। সেই দিন হইতে নৈনিতাল, মসুরি প্রভৃতি রমণীয় প্রদেশ সকল নেপাল-রাজের হস্তচ্যুত হইয়াছে। শিগাউলি হইতে অন্য রেলগাড়ীতে উঠিয়া দেখিতে দেখিতে সূর্য্যাস্তের সময় রক্সলে পৌছিলাম। ষ্টেশনটী অতি ক্ষুদ্র, একখানি গৃহ মাত্র বলিলেও হয়। এখানে ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত। ষ্টেশনেই দেখিলাম ছোট ছোট পানসীর মত কি পড়িয়া রহিয়াছে। এমন যান ত জীবনে কখনও দেখি নাই। জলপথ নয়। স্থলপথে এই নৌকায় চড়িয়া কিরূপে যাইব বুঝিতে পারিলাম না। শুনিলাম ইহার নাম কার্পেট। ইহার তলদেশ কার্পেটে আবৃত বটে। কার্পেটে শয্যা বিস্তৃত হইল। আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কার্পেটে বসিলাম। অমনি চারিজন তাহা স্কন্ধে করিয়া লইল। তখন বুঝিলাম

মহারাজ দেব শামসের ও দেবী কর্ম্মকুমারী।

এ ত নৌকা নয়, এ দোলা। উপকথায় যে দোলার কথা পড়িয়াছিলাম এই বুঝি সেই দোলা। কার্পেটের মাথার উপর একটা কাঠের ঢাকনা, তাহার চারিদিকে ঝালরের মত পর্দ্দা। কার্পেটের দোলায় তুলিতে তুলিতে নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী বীরগঞ্জের হাঁসপাতালে আসিয়া পৌছিলাম। সেই খানেই রাত্রি বাস করা গেল। পর দিন প্রাতে আহারাদি করিয়া পূনরায় কার্পেটে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলাম। বীরগঞ্জে আসিতে আসিতে পথে মহারাজার শীতকালের আবাস সুন্দর প্রাসাদ দেখিলাম। বীরগঞ্জ একটী ক্ষুদ্র সহর। বীরগঞ্জ ছাড়িয়া বিশাল প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। আজ আমাদিগকে প্রায় দশ ক্রোশ যাইতে হইবে। প্রান্তর ছাড়িয়া দিবা শেষে এক জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। শুনিলাম চারিক্রোশ ক্রমাগত এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌছিতে হইবে। জঙ্গলের ভিতর এক এক ক্রোশ অন্তর একটী জলের কল আছে। ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী মহারাজ দেবশামসের স্বর্গীয়া পত্নী দেবী কর্ম্মকুমারীর স্মরণার্থ এই সকল জলধারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রত্যেক জলধারার উপর দেবনাগরী অক্ষরে সেই স্বর্গবাসিনীর নাম লিখিত আছে। ক্লান্ত পথিক তুই হস্তে অমৃতশীতল জলধারা পান করে, আর মনে মনে সেই সাধ্বীকে সহস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে। আমদের বাহকগণও এখানে জলপান করিয়া শীতল হইল। জনমানবহীন শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলের ভিতর, রজনী সমাগত হইল। সঙ্গে

মশাল, লণ্ঠন কিম্বা অন্য কোন আলো নাই। ঝিল্লীনিনাদিত গভীর অরণ্যে নিঃশব্দে ব্যাকুল চিত্তে কয়টী প্রাণী যাইতেছি। আমাদের মন ত্রাসে উৎকণ্ঠিত। শিশুসন্তানগণ ক্ষুধা এবং নিদ্রায় আকুল। আবার কোথা হইতে মাছির ন্যায় কি গায়ে পড়িতেছে। তাহার দংশনে সকলে আরও অস্থির হইয়া পড়িল। শ্রাবণ মাসে এতদঞ্চল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়। আমরা ব্যাকুল চিত্তে ক্রমে রাত্রি ৯টার সময় বিছাকরির পান্থনিবাসে পৌছিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। দোতলায় প্রশস্ত গৃহে বেঞ্চ টেবিল এবং শয়নের জন্য খাট রহিয়াছে দেখিলাম। তখনি শয্যা প্রস্তুত হইল। শিশুগণ শয়ন করিল, এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করিল। আমরা দুইটী অন্নের প্রত্যাশায় রাত্রি ১০॥।১১টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অর্দ্ধ সিদ্ধ দুটী ভাত খাইয়া শয়ন করিলাম। পর দিন প্রাতে আহার করিয়াই পুনরায় যাত্রা করিলাম। বিছাকরি হইতে বরাবর একটা পার্ব্বত্য নদীর বারিশূন্য তল ধরিয়া চলিলাম। কেবল বালুকা এবং নুড়ি, মধ্যে মধ্যে ঝির ঝির করিয়া জল আসিতেছে। কাটমণ্ডু যাইবার পথ বরাবর প্রায় এই প্রকার। হয় নদীর মধ্য দিয়া না হয় নদীর ধার দিয়া যাইতে হয়। মধ্যে মধ্যে বাহকগণ আমাদের স্কন্ধে লইয়াই খরস্রোতা নদীতে অবতরণ করিয়া পার হইয়া যায়। বিছাকরি হইতে তিন ক্রোশ মাত্র দূরে চুরিয়ার পান্থনিবাসে আমরা আশ্রয় লইলাম। চুরিয়ার পান্থশালাটী যদিও বিছাকরির ন্যায় প্রশস্ত নয়, কিন্তু স্থানটী বেশ নির্জ্জন এবং সুন্দর। পর দিন প্রাতে আহারাদি

সম্পন্ন করিয়া পুনরায় কার্পেটারোহণ। আজিকার পথে দৃশ্য বড় সুন্দর। ক্রমে যত যাইতেছি দুই ধারে গভীর জঙ্গলাবৃত পর্ব্বতসকল অটল অচল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারি দিক নিস্তব্ধ। দিবাভাগেই ঝিল্লিকাগণ ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করিতেছে। মাঝে মাঝে পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরণার জল পড়িতেছে। প্রকৃতির কি স্তব্ধ সুগম্ভীর ভাব! চারি দিকের সুন্দর শান্ত সৌন্দর্য্যে আমাদের প্রাণ বিস্ময়ে ও পুলকে স্তব্ধ হইয়া গেল। কোথাও দেখি পার্ব্বত্য নদী কল কল ছল ছল করিয়া যেন লাফাইতে লাফাইতে নামিয়া আসিতেছে। কি বিক্রম! কি গর্জ্জন! জল অতি স্বাদু, অতি নির্ম্মল, অত্যন্ত শীতল। পথে কেবল পর্ব্বত এবং জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে কেবল দুই এক ঘর বসতি দেখিলাম। বাহকগণ সেখানে আহার ও বিশ্রাম করে। পথে হেটুরা নেবুয়াটার প্রভৃতি স্থানে পান্থনিবাস আছে বটে, কিন্তু বর্ষাকালে সেখানে "আউল" নামে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। এক বার তাহার কবলে পড়িলে আর রক্ষা নাই। আমরা এ সকল পান্থনিবাসে পদার্পণ করিলাম না। তৃতীয় দিন প্রায় ৯ক্রোশ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ভীমফেদীর পান্থনিবাসে প্রায় সন্ধ্যার সময়ে উপনীত হইলাম। এখানে বিস্তর যাত্রীর সমাগম দেখিলাম।

দ্বিতল গৃহে আশ্রয় লইলাম বটে কিন্তু স্বচ্ছন্দে বাস করিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। আহারের ক্লেশ পথে যথেষ্ট। মোটা চিড়া ও মোটা চাউল ভিন্ন কিছুই মিলে না।

সঙ্গে প্রচুর আহারের সংস্থান করিয়া না আসিলে বিলক্ষণ

আহারের ক্লেশ পাইতে হয়। আমাদের সঙ্গে ভৃত্য ও পাচক ছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা না থাকায় সঙ্গে যথেষ্ট আহার্য্য আনা হয় নাই। সুতরাং সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভীমফেদী উপত্যকার ন্যায়, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা বেষ্টিত। পরদিন প্রত্যুষে আহারাদির কোন চেষ্টাই না করিয়া শিশুসন্তানদিগের জন্য মহিষের দুগ্ধের সংস্থান করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। পথের কষ্টে নাকাল হইয়া আজ আমাদের প্রতিজ্ঞা কাটমণ্ডুতে পৌঁছিতেই হইবে। ভীমফেদী হইতে বাহির হইয়া অতি অল্পক্ষণেব মধ্যেই পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। ওঃ সে কি ভয়ানক পথ! যেন সোজা ভাবে উঁচু হইয়া উঠিতেছে। পথে না আছে গাছ পালা না আছে আশ্রয়। পথও কি তেমনি? পা দিবা মাত্র নোড়া নুড়ি গড়াইয়া পড়িতেছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে ভয় হইতেছে বাহকগণ এইবার বুঝি আমাদের স্কন্ধে লইয়া গড়াইয়া তলায় পড়িয়া যায়। বাহকগণও গলদ্‌ঘর্ম্ম, অতি কষ্টে সাবধানে উঠিতেছে আর মুখে "নারাণ" "নারাণ" বলিতেছে। নিশ্চিত, নেপালী বাহক ভিন্ন সে পথে আর কেহ ভার বহন করিয়া যাইতে পারে না। পথ এমন সোজা যে আমাদের কার্পেট হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। ক্রোড়ের শিশুকে এক হস্তে চাপিয়া ধরিয়া আর এক হস্তে কার্পেট চাপিয়া ধরিয়াছি, আর বারংবার সকলকে সাবধান করিয়া দিতে হইতেছে। এই ভীষণ খাড়াই যেন শেষ হয় না। প্রায় ২৩০০ ফুট এই ভাবে উঠিলাম, ভয়ে যেন হৃৎপিণ্ডের শোণিত খর বেগে চলিতে চলিতে সহসা বন্ধ

হইয়া আসিল। এই ভাবে অতি কষ্টে শিখরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহকগণ কার্পেট নামাইয়া হাঁপাইতে লাগিল; আমরা বাঁচিলাম। এই স্থানের নাম চিসাপাণিগড়ি। এখানে গড় এবং সৈন্য আছে। এই পথে শত্রুর আগমন প্রতিরোধ করিবার জন্য সমুদয় ব্যবস্থা আছে! স্থানটী খুব উচ্চ এবং শীতল। চিসাপাণিগড়ি হইতে নীচের পথে ভীমফেদীর উপত্যকা দেখা যায়। গড়িতে পৌছিয়া দেখিলাম আমাদের জন্য কাটমণ্ডু হইতে লোক আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে ফল খাদ্যদ্রব্য ছিল। উহা আনিয়া শিশুগণ ও বাহকগণ সকলে আনন্দে ভোজন করিল। আজ আমাদের পথের শেষ দিন, আজ পথ যেরূপ কঠিন, দূরত্বও তদ্রূপ। গড়ি হইতে ক্রমে নামিয়া কুলিখানি নামক সুন্দর স্থানে আসিলাম। সেখানে খরস্রোতে গর্জ্জন করিতে করিতে এক পার্ব্বত্য নদী নামিয়া যাইতেছে। তাহার উপর সুন্দর পুল। পুলের উপর দিয়া সকলে পদব্রজে পর পারে উপস্থিত হইলাম। সেখানে অতি সুরম্য পান্থ-নিবাস রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের সেদিন বিশ্রামের সময় নাই। আজ ক্রমাগত পাহাড় ভাঙ্গা। একটা হইতে অন্যটা—সেটা হইতে আর একটা। এই প্রকারে ক্রমাগত তিনটা উচ্চ উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিলাম। ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল। কিন্তু আমাদের গন্তব্যস্থান বহুদূরে। আমরা চন্দ্রগিরি নামক শেষ পাহাড়ে নামিতে লাগিলাম। সে কেবলই নামা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় অবতরণ করিতেছি। চন্দ্রগিরি হইতে কাটমণ্ডুর উপত্যকা সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আমাদের

দর্শনলালসা চরিতার্থ হইতে দিল না। চন্দ্রগিরি হইতে অবতরণ করিয়া আমরা সমতলে পদার্পণ করিলাম। সে স্থানের নাম থানকোট। সেখানে জনসমাগম এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ দেখিয়া মনে হইল এইবার বুঝি কাটমণ্ডুতে পৌঁছিলাম। কিন্তু থানকোট হইতে অন্ধকারে তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় রাত্রি ৯টার সময় আমরা কাটমণ্ডু সহরে প্রবেশ করিলাম। কেবল দু'ধারে গীতবাদ্যের শব্দ কর্ণে আসিতে লাগিল। তখন আমরা এত পরিশ্রান্ত যে পর্দ্দা সরাইয়া—দুই ধারের দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা হইল না। ইহা ভিন্ন এ সহরে * কলিকাতার ন্যায় পথপার্শ্বে আলোক নাই, সব অন্ধকার—কেবল গীত বাদ্য কর্ণে আসিতে লাগিল। বাসায় আসিয়া পৌঁছিতে প্রায় ১০টা বাজিয়া গেল। আমরা সুসজ্জিত আলোকিত গৃহ এবং বন্ধুর পরিচিত মুখখানি দেখিয়া যেন অবসন্ন দেহে প্রাণ পাইলাম।

* এখন কাটমণ্ডুতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে। সহর এখন উজ্জ্বল।

হনুমানঢোকা ও কাটমণ্ডু সহর
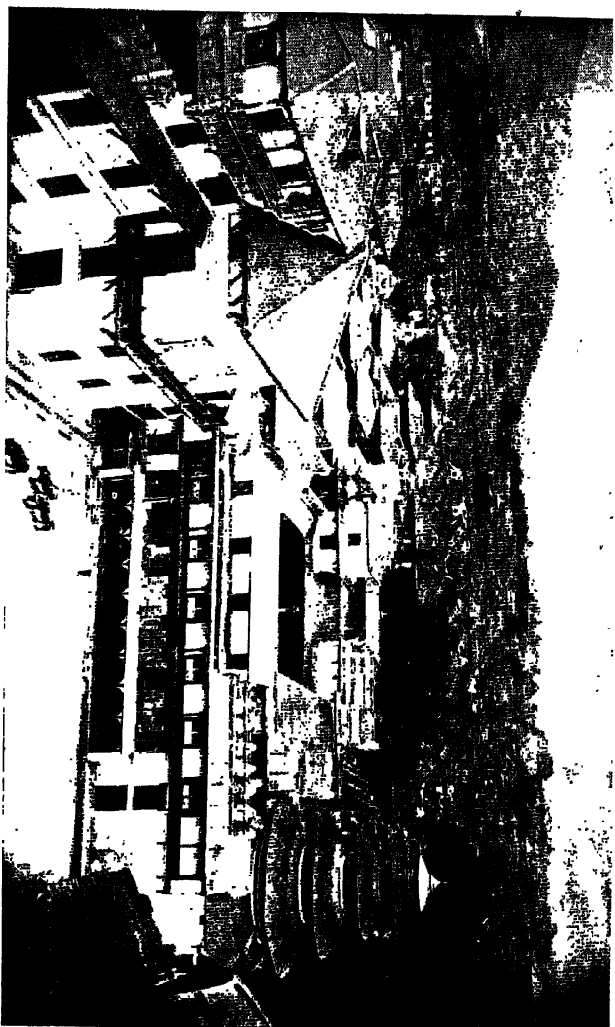
কাটমণ্ডু

নেপাল হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত এক বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশ। এই যে বিস্তীর্ণ প্রদেশ, ইহা স্বাধীন হিন্দু রাজার রাজ্য। একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এ দেশ বর্ত্তমান হিন্দু রাজার অধীন ছিল না। তখন নেওয়ার নামধেয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এক মিশ্রজাতি এদেশে রাজত্ব করিত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে গুর্খাবংশীয় পৃথ্বীনারায়ণ নামে জনৈক হিন্দু নরপতি নেওয়ার রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমুদয় নেপালে রাজ্য বিস্তার করেন। সম্প্রতি নেপালরাজ পৃথ্বীবীর বিক্রম শাহ গতাসু হইয়াছেন। নেপালের বর্ত্তমান নরপতি মহারাজাধিরাজ ত্রিভূবন বিক্রম ইহারই শিশুপুত্র। মোগলশাসন সময়ের মহারাষ্ট্রের ন্যায় বর্ত্তমান নেপালেও মন্ত্রিরাজত্ব প্রচলিত। কাটমণ্ডু নেপালের রাজধানী। ইহা সমুদ্রতল হইতে ৪,৫০০ ফুট উচ্চ। এক বিস্তীর্ণ উপত্যকার এক অংশে কাটমণ্ডু সহর অবস্থিত। পূর্ব্ব পশ্চিমে এই উপত্যকার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল হইবে।—প্রস্থে, উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৫ মাইল হইবে। কাটমণ্ডু আগমন কালে চন্দ্রগিরির শিখর দেশ হইতে এই বিস্তীর্ণ উপত্যকাটী চিত্রপটের ন্যায় চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। ইহা চতুর্দ্দিকে উন্নত পর্ব্বতমালায় অবরুদ্ধ, কেবল দক্ষিণে বাঘমতি নদীর নির্গমন স্থলে এক বিচ্ছেদ আছে। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে,

অতি পুরাকালে ইহা নাগবাস নামে এক প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য হ্রদ ছিল। মানজুশ্রী বোধিসত্ত্ব নামে চীন দেশ হইতে সমাগত এক মহাত্মা স্বীয় তরবারির আঘাতে পর্ব্বত ভেদ করিয়া ইহার বারিরাশি নির্গমের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তখন হইতে ইহা মনুষ্যের আবাসের উপযোগী হইয়াছে। এই কিম্বদন্তী অনেক কারণে নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই উপত্যকা একেবারে সমতল। এবং কঙ্করশূন্য নদীতলের ন্যায় পল্ললময়। যদি এখনও কোন উপায়ে বাঘমতি নদীর বারি নির্গমের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই রমণীয় উপত্যকা ভবিষ্যতে পুনরায় পার্ব্বত্য হ্রদে পরিণত হইতে পারে।

কাটমণ্ডু সহর পূর্ব্বে কান্তিপুর নামে অভিহিত হইত। ৭২৩ খৃষ্টাব্দে রাজ গুণরাম দেব এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন।

একদা তিনি মহালক্ষ্মীর পূজা করিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বপ্নে দেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন "বাঘমতি এবং বিষ্ণুমতি নদীর সঙ্গম স্থলে এক সহর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পুরাকালে তথায় নীমুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। এই নূতন সহরের আকৃতি দেবীর খড়্গের ন্যায় হইবে। এ সহরে প্রতিদিন লক্ষটাকার কারবার হইবে।" শুভলগ্নে রাজা পাটন হইতে কান্তিপুরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন। সহরে ১৮০০০ হাজার গৃহ নির্ম্মিত হইল। লক্ষী প্রতিজ্ঞা করিলেন যতদিন না সহরে লক্ষটাকার কারবার হয় ততদিন তিনি এই সহরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া অবস্থিতি করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে কান্তিপুর নামের পরিবর্ত্তে ইহা কাটমণ্ডু নামে

অভিহিত হইয়া থাকে। সহরের মধ্যভাগে পুরাতন রাজপ্রাসাদের সন্নিকটেই কাটমণ্ডু নামে এক কাষ্ঠের গৃহ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষিণা সিংহ মল্ল ইহা ফকীরদিগের আবাসের জন্য নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই কাটমণ্ডু অর্থাৎ কাষ্ঠময় নিকেতন হইতে কাটমণ্ডু নামের উৎপত্তি। যদিও এই কাষ্ঠময় নিকেতন অত্যন্ত পুরাতন হইয়াছে, তথাপি ইহা এখনও ফকীরদিগের আশ্রয়রূপে দণ্ডায়মান আছে। কাটমণ্ডু বর্ত্তমান গুর্খা রাজবংশের রাজধানী বটে, কিন্তু নেওয়ার রাজাদিগের রাজত্ব কালে পাটন, ভাতগাঁও, কীর্ত্তিপুর প্রভৃতি প্রধান সহর ছিল। এই সকল সহর পূর্ব্বে প্রাচীর-বেষ্ঠিত ছিল, এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া সহরে প্রবেশের পথ ছিল। সচরাচর এই সকল দ্বার উন্মুক্ত থাকিত, কেবল যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোনরূপ বিশেষ কারণে রুদ্ধ হইত। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীর বা প্রবেশ দ্বার সকলের কোন চিহ্ন নাই। গুর্খা রাজত্বকালে তাহা ক্রমে লোপ পাইয়াছে। এইরূপে কাটমণ্ডু সহরে প্রায় ৩২টী প্রবেশদ্বার ছিল। যদিও প্রাচীর নাই কিন্তু সহরের সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সীমার মধ্যে কোন নীচজাতীয় ব্যক্তির বাস করিবার অধিকার নাই। এবং আরও অনেক নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। বাঘমতি এবং তাহার শাখা এই কাটমণ্ডু সহর বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সহরের ঠিক মধ্য ভাগে নেওয়ার রাজা-দিগের পুরাতন প্রাসাদ হনুমান ঢোকা অদ্যাবধি দণ্ডায়মান আছে।

বর্ত্তমান সময়েও এই বিচিত্র প্রাসাদমালা হনুমানঢোকা নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। সিংহদ্বারের সম্মুখে হনুমানের এক প্রকাণ্ড

বিগ্রহ দণ্ডায়মান আছে। ঢোকা অর্থাৎ দ্বার। এই বিচিত্র প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণনির্ম্মিত। বাহির হইতে দেখিলে ইহাকে সৈন্যবাস বা কারাগৃহ বলিয়া মনে হয়। ইহার গঠন প্রণালী বর্ত্তমান রুচিসঙ্গত নয়। বর্ত্তমান নরপতি এই প্রাসাদে অবস্থিতি করেন না। হনুমানঢোকার সম্মুখে এবং চতুর্দ্দিকে নানা সুদৃশ্য দেবমন্দির, স্তম্ভ প্রভৃতি পুরাকীর্ত্তি সকল বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ এই স্থানের দৃশ্যটী অতি মনোরম; হনুমানঢোকার অদূরে ভৈরবের এক প্রস্তর-নির্ম্মিত বীভৎস প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাহার চক্ষু গোলাকার, দন্ত-পংক্তি ভীষণ ভাবে প্রকটিত। হনুমানঢোকার প্রায় ৪০০ হাত দূরে কোট নামে এক নব্য ধরণের গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্যাকৃ-তিতে ইহার কোন বিশেষত্ব নাই বটে কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাসে ইহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর এখানে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিনই সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গ-বাহাদুরের অভূতপূর্ব্ব গৌরবের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। তাই আজও কোটের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রক্তাক্ত স্মৃতি হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তোলে। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজার ইন্দ্রচক। ইন্দ্রচক কলিকাতার বড়বাজার বলিয়া ভ্রম হয়। বিলাতী পণ্যদ্রব্যে ইহা সুশোভিত। সহরের রাস্তা সকল অপ্রশস্ত এবং প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অধিকাংশ স্থান অত্যন্ত অপরিষ্কার। দুই পার্শ্বে উন্নত দ্বিতল গৃহ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল গৃহ আমাদের দেশের গৃহের ন্যায় নহে। কারুকার্য্যখচিত কাষ্ঠের বারান্দা প্রত্যেক গৃহের প্রধান সৌন্দর্য্য। গৃহ সকল ক্ষুদ্র,
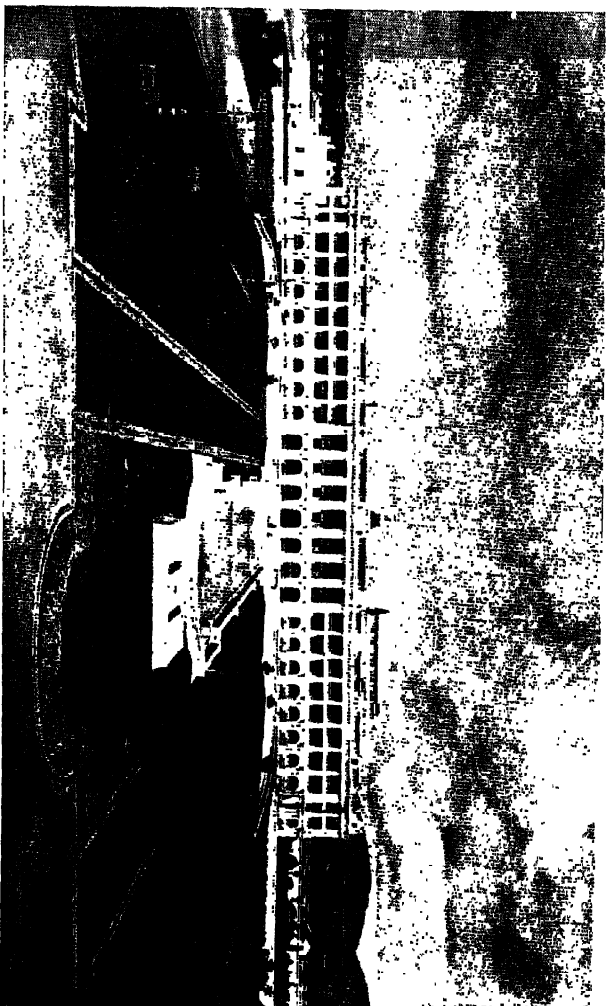
সিংহ দরবার

আলোকশূন্য—গবাক্ষ সকল ক্ষুদ্র ও বিচিত্র কারুকার্য্যে শোভাযুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া এখন কাটমণ্ডু সহরে কলিকাতার ন্যায় প্রকাণ্ড সুশোভিত অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইতেছে। সহরের বাহিরে উত্তরপূর্ব্ব দিকে এক প্রকাণ্ড ময়দান আছে। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল হইবে এবং প্রস্থে প্রায় তাহার এক তৃতীয়াংশ। এই স্থানে সর্ব্বদাই কাবাজ খেলা হয়। ইহাকে টুনিখিল বলে। ইহা অনেকটা কলিকাতার গড়ের মাঠের ন্যায়। টুনিলিখের মধ্যে তিনটী মুর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। (১) জঙ্গবাহাদুর (২) বীর শামসের (৩) ভীমসেন থাপা। টুনিখিলের দক্ষিণে প্রকৃত কাটমণ্ডু সহর।

বর্ত্তমান সময়ে টুনিখিলের চতুর্দ্দিকে অনেক সুদৃশ্য প্রাসাদ এবং অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল অট্টালিকা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। এই প্রশস্ত ময়দানের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মহারাজ চন্দ্রশামসের বাহাদুরের সিংহ দরবার নামে শ্বেত সৌধমালা দণ্ডায়মান থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। মহারাজ চন্দ্রশামসের সাহেবের প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গবাহাদুর মহাশয়ের থাপাথলির দরবার দেখিতে পাওয়া যায়। বাঘমতির অপর তীর হইতে এই সকল প্রাসাদমালা কাটমণ্ডু প্রবেশ কালে দর্শকের নয়নগোচর হয়। এই স্থানে সম্প্রতি একটী নূতন পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। বীরসামসের মহারাজার সময়ে কাটমণ্ডু সহরের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

টুনিখিলের পশ্চিম দিকে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বীর হাঁসপাতাল ও দরবার স্কুল শোভা পাইতেছে। উত্তরে রাণী পুকুর এবং মহারাজ বীরশামসের সাহেবের অতি সুশোভন লাল দরবার নামক প্রাসাদ। রাণীপুকুরের মধ্যে একটী দেবমন্দির আছে। এই সুন্দর সরোবরটী প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা প্রতাপমল্ল পুত্রশোক-কাতরা পত্নীর সান্ত্বনার জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এবং ভারতবর্ষের সমুদায় তীর্থ হইতে পবিত্র বারি আনিয়া ইহাতে রক্ষিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি এই সরোবরের দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীর উপর প্রতাপমল্ল এবং তাঁহার রাণীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পারে বীর লাইব্রেরী এবং ঘটিকাগৃহ আছে। ইহার বীরশামসের মহারাজার কীর্ত্তি। তিনি কাটমণ্ডু সহরে ড্রেণ এবং জলের কল নির্ম্মাণ করিয়া সহরবাসীর প্রভূত উপকার করিয়াছেন। তিনি নানা উপায়ে কাটমণ্ডু সহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ চন্দ্র শমসের সম্প্রতি বৈদ্যুতিক আলোর ব্যাবস্থা করিয়া সহরের একটী বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন।

বীরশামসের মহারাজার লাল দরবারের উত্তরে রাণা পরিবারস্থ অনেক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সুদৃশ্য প্রাসাদ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। আরও উত্তরে বর্ত্তমান নরপতি মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বিক্রম শাহের রাজভবন। তিনি এখন হনুমানঢোকায় অবস্থিতি করেন না। সহরের একেবারে উত্তরে পর্ব্বতের পাদদেশে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি।

টুনিখিলের পশ্চিমদক্ষিণে কলিকাতার অকটারলনি মনুমেণ্টের অনুরূপ একটী মনুমেণ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সুবিখ্যাত রাজমন্ত্রী ভীমসেন থাপা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মনুমেণ্টের নিকটেই তাঁহার বাঘ দরবার নামে প্রাসাদ অদ্যাবধি আছে। টুনি-খিলের পশ্চিম দিকে বীর হাঁসপাতালের সন্নিকটে আর একটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। ইহা মহ্কালের মন্দির। স্বয়ং রাণা মহারাজ ইহার সম্মুখ দিয়া কখন ইহাকে দর্শন না কয়িয়া গমন করেন না। মন্দিরটী অতি পুরাতন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধগণ ইহা স্থাপন করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধ হিন্দু সকলেই ইহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। ইহার প্রভূত সম্পত্তি এবং বিস্তর উপাসক। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে টুনিখিলের চতুর্দ্দিকের হর্ম্ম্যাবলীর দ্বারা সহরের সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আবহমান কাল হইতে টুনিখিল সৈন্যদিগের জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে এই স্থানে রণবাদ্য এবং কাবাজ খেলার সময় সৈন্যদিগের অস্ত্রের ঝণ্‌ঝনা শ্রুত হইয়া থাকে। কারণ সৈনিক বিভাগই নেপাল রাজ্যের সমুদায় অর্থ সামর্থ্য গ্রাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের বাহ্যাকৃতি চাল চলন কোনরূপ বীরত্ব কিম্বা গৌরব ব্যঞ্জক নহে। কাটমণ্ডু সহরের প্রাসাদ সকলের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোহারী। দুর্ভেদ্য প্রাকারের ন্যায় চতুর্দ্দিকের সুনীল উন্নত পর্ব্বতমালা উত্তর সীমায় দিগন্তপ্রসারিত হিমানীমণ্ডিত শিখর-

শ্রেণী, উজ্জ্বল আলোক মণ্ডিত সুনীল নভোমণ্ডল, শ্যামল পুষ্পিত বৃক্ষলতা, হৃদয় মন বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া এই সকল অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠে। তখন মনে হয় পুরাণে যে কৈলাসপুরীর বর্ণনা আছে তাহা বুঝি এই! হিমাচলের অঙ্গে অঙ্গে এত সৌন্দর্য্যও বিধাতা ঢালিয়া দিয়াছেন। দেখিয়া দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। দেখি আর ভাবি, কবি যথার্থই গাহিয়াছেন ঃ—

তুমি ধন্য ধন্য হে ;—ধন্য তব প্রেম ;
ধন্য তোমার জগত রচনা।
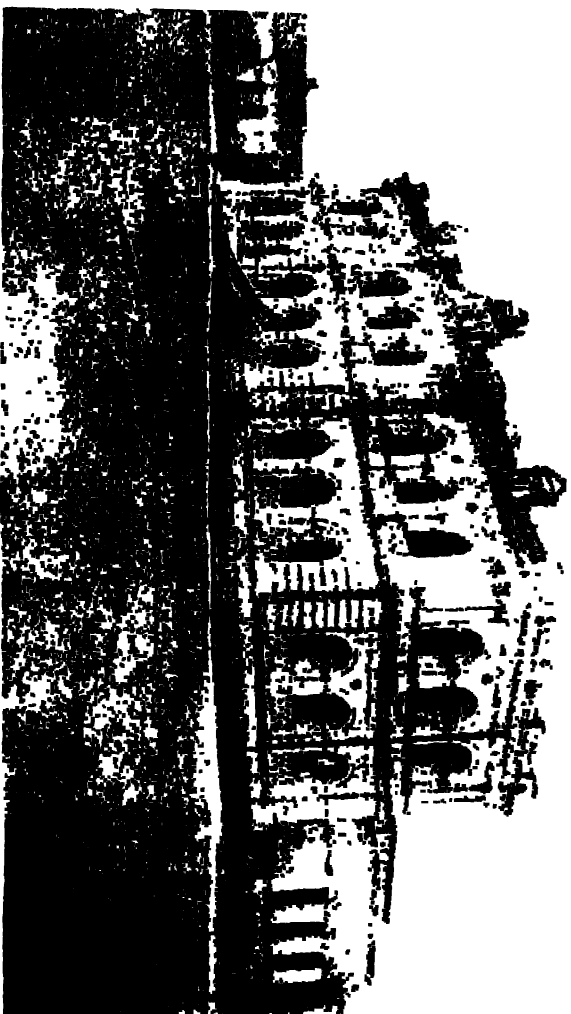
বীর হাঁসপাতাল।

নেপালের অধিবাসীগণ

——:o:——

নেপালের আয়তনের তুলনায় ইহার অধিবাসী বিভিন্ন জাতি সমুদায়ের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। একটী দেশে এরূপ বিভিন্ন জাতির সমাবেশ অতি অল্প স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়ী গুর্খাগণ বর্ত্তমান নেপালের প্রধান অধিবাসী হইলেও জনসংখ্যায় পূর্ব্বতন অধিবাসী নেওয়ারগণই অধিক। গুর্খা এবং নেওয়ার ভিন্ন মগর, গুরুম, লিম্বু (Limbu) কিরাটী, ভুটিয়া, এবং লেপচা গণও (Lepcha), এই প্রদেশের অধিবাসী।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল রাজ্য জয় করেন তখন হইতেই গুর্খাগণ এদেশে সর্ব্বতোভাবে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। গুর্খাগণ হিন্দু এবং রাজপুতবংশোদ্ভব; মুসলমানদিগের অত্যাচারে ইহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ কাটমণ্ডুর বিশ ক্রোশ পশ্চিমে গোরখালি নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। গোরখালি হইতে ইহাদের গুর্খা নামের উদ্ভব। বর্ত্তমান রাজবংশ, প্রধান রাজ-পুরুষগণ, এদেশের সমুদয় প্রধান ব্যক্তি গুর্খাবংশসম্ভূত। সৈনিক বিভাগের অধিকাংশ সৈনিক এবং প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারিগণ সকলেই গুর্খা। বিজয়ী

গুর্খাগণের চরণে, ধন, মান, সম্পদ, সকলই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে তাহাতে আর বিচিত্র কি? অধিকাংশ গুর্খা দেখিতে সুশ্রী। নেপালের উচ্চবংশের মহিলাগণ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী।

ব্রাহ্মণদিগের আকৃতির পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত কৃশ, ক্ষিপ্র, এবং আর্য্যলক্ষণ যুক্ত। নেপালে যেমন বিচিত্র জাতির অধিবাস, কাটমণ্ডু সহরেও সেইরূপ বিচিত্র-মূর্ত্তি মানবের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা গৌরকান্তি দীর্ঘাকৃতি আর্য্য সন্তানের ন্যায়, কেহ বা বলিষ্ঠ দৃঢ় নাতিস্থূল নাতি-দীর্ঘ পীতবর্ণ মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভব অনুমান হয়। আকৃতি এবং বর্ণের বৈচিত্র দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ বা উজ্জ্বল গৌরকান্তি, কেহ বা শ্যাম, কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ। তবে এ কথা বলিতে হয়, হিন্দুস্থানের কৃষ্ণকান্তি এখানে বিরল। অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল বর্ণের।

কি গুর্খা কি নেওয়ার স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ সুদৃশ্য এবং সুসঙ্গত। বাহ্যিক বেশ বিন্যাসে নেওয়ার এবং গুর্খার পার্থক্য কিছুই নাই। পাজামা এবং চাপকানের ন্যায় এক প্রকার জামা, তার উপর সাদা কাপড়ের কোমরবন্ধ, মস্তকে একটী কাপড়ের টুপী, সাধারণ পুরুষদিগের বেশ এই প্রকার। তবে বর্ত্তমান বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে অনেকের দেহে বিলাতী ছাঁটের কোট দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত দীন দরিদ্র পথের ভিখারীর পর্য্যন্ত সমুদয় দেহ বস্ত্রাবৃত। তাহা শত ছিন্ন ধূলিধূসরিত হউক, কিন্তু অর্দ্ধনগ্ন দেহ এ দেশের রাজপথে

কখনও দেখা যায় না। নারীগণ সচরাচর বিশ ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ বিচিত্র বর্ণের শাড়ী পরিধান করে। হিন্দুস্থানী মেয়েদের ন্যায় সম্মুখে কোঁচা, তাহা প্রায় ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে, ঊর্দ্ধাঙ্গে জামা। প্রায় দশ হাত লম্বা নাতিপরিসর কাপড় কোমরে জড়াইয়া রাখে। শাড়ী খানা কোঁচা করিতেই যায়। দেহের উপরার্দ্ধ আবরণের জন্য চাদর বা ওড়না ব্যবহৃত হয়। কুমারী, সধবা, কি বিধবা কাহারও মস্তকে আবরণ নাই। নেপালী রমণী-দিগের কেশ বিন্যাসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা সম্মুখে সিঁতি কাটিয়া পশ্চাতে বেনী রচনা করি; তাহারা পশ্চাতে সিঁতী কাটিয়া কপালের উপরে এক দীর্ঘ বেনী রচনা করে এবং তাহার শেষ ভাগে রক্তিম বর্ণের সুতার গুচ্ছ বাধিয়া আপনাদের সৌভাগ্য প্রকাশ করে। বিধবাগণ লাল সুতা বাঁধে না। বেনীতে লাল সুতা বাধা ভিন্ন সধবাদের আর দুইটী লক্ষণ আছে। হাতে কাঁচের চুড়ি, গলায় পুঁথির মালা। এই দুইটাই কিন্তু বিলাতি জিনিষ। সধবাদিগের প্রধান লক্ষণ এই দুইটী বিলাতি জিনিষ কিরূপে হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। রাজরাণী হইতে পথের ভিখারিণী পর্য্যন্ত হাতে কাঁচের চুড়ি গলায় পুঁথির মালা; নেপালে এবম্বিধ লক্ষণযুক্তা রমণী দেখিলেই তাঁহাকে ভাগ্যবতী পতিযুক্তা স্থির করিতে হইবে। হিন্দুস্থানী কিংবা বাঙ্গালী রমণীর ন্যায় নেপালি নারীকূলের অঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নাই।

মস্তকে সোনার গহনা, কাণে বড় বড় পাশার ন্যায় সোনার ফুল, গলায় পদকের ন্যায় গহনা। চরণে পাঁয়জর ভিন্ন অন্য কোন

অলঙ্কার দেখা যায় না। উপর হাতে কোন প্রকার অলঙ্কার কিম্বা নাসিকায় নথ এদেশে কখনও দেখি নাই।

রাজ পরিবারের এবং ধনী গৃহস্থদের মহিলাগণ সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় কোঁচা করিয়া বস্ত্র পরিধান করেন না। তাঁহারা পাজামা, জ্যাকেট এবং ওড়না ব্যবহার করেন। প্রায় বিশ গজ কাপড়ে একটী পাজামা প্রস্তুত হয়। পরিধানকালে তাহাকে পাজামা বলিয়া বোধ হয় না—অনেকটা পেটিকোট কিম্বা বেলুনের ন্যায় দেখায়। বিধবা ভিন্ন কেহ শুভ্র বসন পরিধান করে না। উচ্চ পরিবারের রমণীগণ সর্ব্বদা জুতা মোজা পরিধান করিয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দু আচারের কোন ব্যতিক্রম হয়না। পূজা কিম্বা আহারের সময় জুতা মোচন করিলেই চলে। নেপালী সুন্দরীগণ যখন বেশবিন্যাস করিয়া শকটারোহনে রাজপথে বাহির হন তখন তাঁহাদিগকে পরীর দল কিম্বা প্রজাপতির ঝাঁকের ন্যায় দেখায়। কজ্জল শোভিত আয়ত নয়ন, তদুপরি অঙ্কিত ভ্রূযুগল, রাজ পরিবারের মহিলাগণ স্বাভাবিক ভ্রূর পরিবর্ত্তে কজ্জল দ্বারা ভ্রূ অঙ্কিত করেন। রক্তাভ অধরোষ্ঠগণ্ডস্থলবিশিষ্ট শুভ্রমূর্ত্তি রমণীকুল যখন বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া রাজপথে দর্শন দেন এবং তাঁহাদের সূক্ষ্ম ওড়না বায়ুভরে উড়িতে থাকে তখন যে তাঁহাদিগকে পরীর দল বলিয়া ভ্রম হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? নেপালীরা গোঁড়া হিন্দু বটে কিন্তু আমাদের দেশের আচার ব্যবহারের সহিত ইহাদের পার্থক্য অনেক। শীতপ্রধান দেশ বলিয়াই বোধ হয় এখানে অবগাহন এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তনের রীতি সেরূপ

নাই। উচ্ছিষ্টের বিচার আমাদের দেশের ন্যায় নহে। এদিকে আবার রন্ধনশালায় বসিয়া না আহার করিলে চলে না। প্রস্তুত অন্ন রন্ধনগৃহের বাহিরে ভোজন করা বিধেয় নহে। এই জন্য ভিন্ন জাতীয়েরা এক রন্ধনশালায় আহার করিতে পারে না। পতি হয়ত ক্ষত্রিয়, পত্নী ভোট সুতা, এমন এমন স্থলে পতি পত্নীকে ভিন্ন ভিন্ন রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রন্ধনশালায় আহার করিতে হয়। তাঁহাদের সন্তানেরা তৃতীয় রন্ধনশালায় আহার করে। একই গৃহে তিন সংসার। বলা বাহুল্য এখানে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ চলিত আছে। অন্য জাতীয় ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া পান, তামাক কিম্বা জল পর্য্যন্ত পান করা চলে না। নেপালে আমাদের দেশের ন্যায় অবরোধ প্রথা নাই (নেপালের বাহিরে ইহারা অবরোধ প্রথা মানিয়া চলেন)। শ্বশুর শ্বাশুড়ী কিম্বা অন্য গুরুজনের নিকট বধূগণ অবলীলাক্রমে উপনীত হন ও প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ পূজা অর্চ্চনায় এবং ধর্ম্মাচরণে দিবসের অনেক সময় ব্যয় করিয়া থাকেন। গুর্খাগণ সাহসী সৈনিক বটে, কিন্তু পরিশ্রমী, কার্য্যকুশল জাতি নহে। তাহারা কৃষি কিম্বা শিল্পকর্ম্মে অনুরক্ত নহে। দেশের যতপ্রকার শ্রম-সাধ্য কিম্বা সূক্ষ্ম কার্য্য আছে তাহার অধিকাংশই নেওয়ারদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কি স্বদেশে কি বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য অধিকাংশই তাহাদিগের হস্তে; সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে অনেক সম্পন্ন ব্যক্তি আছে। লেখা পড়ার কার্য্যেও অধিকাংশ স্থলে নেওয়ারগণই নিযুক্ত। কাটমণ্ডু এবং তাহার নিকটস্থ

স্থান সমূহে অধিকাংশ নেওয়ারের বাস। নেপালের অন্যান্য অংশে তাহাদিগের সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে। নেওয়ারগণই বস্তুতঃ নেপালের আদিম অধিবাসী। তাহারা অধিকাংশই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুরাজার রাজ্যে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আর কিছুদিন পরে ইহার অস্তিত্ব থাকিবে কিনা সন্দেহ। নেওয়ারগণকে কিছুতেই অসভ্য জাতি বলা যায় না। অপেক্ষাকৃত শান্ত, কার্য্যকুশল, শ্রমনিপুণ হইলেও সামাজিক নীতিতে এ জাতি গুর্খাদিগের তুলনায় হীন। জনসাধারণের ভিতর বিবাহবন্ধন অত্যন্ত শিথিল। নেওয়ারণীদিগের ভিতর পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বিশেষ আদর আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য উচ্চ পরিবারের নেওয়ারদিগের সম্বন্ধে একথা খাটে না। নেওয়ারদিগের কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে পিতামাতা সচারাচর বিবাহ দিয়া থাকে বটে, কিন্তু একই পতির গৃহে তাহাদের জীবনের অবসান হয় না। সুযোগ এবং সুবিধা হইলে যে কোন কারণে তাহারা পত্যন্তর গ্রহণ করে। বিধবা হইলে ত কথাই নাই। ধরিতে গেলে নেওয়ারনীগণ কখনই বিধবা হয় না। অনেকস্থলে সহোদর ভ্রাতাগণের ভিন্ন ভিন্ন পিতা। গুর্খাদিগের বিবাহবন্ধন কিম্বা সামাজিক নীতি এরূপ শিথিল নহে; অন্ততঃ নারীগণ সম্বন্ধে। যথায় বহুবিবাহ এবং দাসত্ব প্রথা বিদ্যমান, তথায় পারিবারিক জীবনে ধর্ম্মনীতির উচ্চ আদর্শ অন্বেষণ করা বাতুলতা মাত্র। নেপালীদিগের ভিতর গুরুভক্তি এবং ব্রাহ্মণভক্তি অতিশয় প্রবল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা

মাতা কিম্বা অন্যান্য গুরুজনের চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া অভিবাদন করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণের পদরজঃ গ্রহণের ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ হাস্যোদ্দীপক। ধূলিতে মস্তক রাখিয়া পদরজঃ গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহারা অর্দ্ধপথে মস্তকে চরণ তুলিয়া দেন। সকল প্রকার ক্রিয়া কর্ম্মে বার ব্রতে ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে দান করিতে হয়। প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থ কুল পুরোহিতকে যথেষ্ট সম্মান এবং দক্ষিণা দিয়া থাকেন। অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ করিলেও ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা নাই। মহারাজ জঙ্গ বাহাদুরের সময় হইতে এদেশে সহমরণের ব্যবস্থা স্থগিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে দলে দলে গুর্খারমণীগণ পতির চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে নেপালে সহমরণ প্রথা একেবারে নাই। পূর্ব্বে নেওয়ারদিগের ভিতরও সহমরণ প্রথা ছিল। কাটমণ্ডু সহরবাসীগণ ভিন্ন, নেপালের জনসাধারণ কোন প্রকার বিলাসিতার ধার ধারে না। ভারতবর্ষের পুরাকালের অবস্থা যদি কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তাহা হইলে নেপালের অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। নেপালী মাত্রকেই কৃষক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক গৃহস্থ বৎসরের চাউল তরকারী আপনার ক্ষেত্রে উৎপাদন করে। ভারতবর্ষের ন্যায় নিরন্ন ব্যক্তির বাহুল্য এখানে নাই। গৃহে গাভী কিম্বা মহিষ, ক্ষেত্রে মোটা চাউল, মক্কা গম, শাক তরকারী, অধিকাংশের গৃহেই আছে। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই দরিদ্র এবং ধনীর গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। তৎপরে সকলে দিবসের কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

কার্য্য করিতে করিতে ক্ষুধা পাইলেই শুষ্ক চিড়া বা অন্য কিছু জলযোগ করে। দিবাশেষে পুনরায় অন্নগ্রহণ করে। অনেক দরিদ্র লোকের দুইবেলা অন্ন জোটেনা। কিন্তু সহজলভ্য ফল মূল দ্বারা উদরজ্বালা নিবারণ করে।

প্রার্ব্বত্য প্রদেশ হইলে কি হয় এদেশের মৃত্তিকায় ফল শস্য প্রচুর জন্মে। ভারতবর্ষের কুত্রাপি এত প্রচুর এবং সুলভ ফল শস্য জন্মে কি না সন্দেহ। নেপালে শীত এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফল ও শস্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশের নরনারী উপবাস ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না। বৎসরের মধ্যে এক দিন (তীজব্রতে) নেপালী রমণীর নীরাম্বু উপবাস করিবার ব্যবস্থা আছে। সেই দিন তাহাদিগের নিকট এক বিষম দিন—সেই এক দিনের অনশন তাহাদিগের নিকট বিষম বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশের বিধবাদিগকে দেখিলে না জানি তাহাদিগের কি বিস্ময়ের উদয় হয়। নেপালের জনসাধারণ অত্যন্ত মাংসাহার প্রিয়, তাহাদিগের নিকট ইহা অপেক্ষা ঈপ্সিত আহার্য্য আর কিছু নাই। ভারতবাসীর অলীক সভ্যতা, অভাব, দারিদ্র, উপবাস, ইহাদিগের নিকট অজ্ঞাত। নেপালের প্রজাবর্গ দরিদ্র বটে, কিন্তু ইহারা অর্থহীন দরিদ্র ; নিরন্ন, অনাহারক্লিষ্ট, করভারে প্রপীড়িত, জীর্ণ দেহ, মনুষ্যকঙ্কাল নহে। ইহারা দৃঢ় বলিষ্ট, কর্ম্মঠ ও প্রসন্নমূর্ত্তি। তবে অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকে বলিয়া ইহাদিগকে দেখিলে প্রীতির উদয় হয় না। গন্ধগোকুলের ন্যায় তাহারা যেখানে যায় দুর্গন্ধ বিস্তার করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি

নেপালী মাত্রেই কৃষক। ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই আপন আপন ক্ষেত্রের কর্ম্মে নিযুক্ত। জন সংখ্যার এক অংশ মাত্র সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত। নেপালের পশ্চিমাংশে অধিকাংশ মগর এবং গুরুমের বাস। তাহারা অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ইহাদিগের আকৃতি মঙ্গোলীয় জাতির ন্যায়। ইহারা সৈনিক কার্য্যের বিশেষ উপযুক্ত। নেপালের পূর্ব্বাংশে লিম্বু ও কিরাতিদিগের বাস। তাহারাও সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত। ইহারাও মঙ্গোলীয় বংশজ এবং অতি উত্তম শিকারী। সিকিমের নিকট লেপচাদিগের বাস। ইহারা দেখিতে ভূটিয়াদিগের ন্যায় কুৎসিত নহে। তিব্বত এবং নেপালের মধ্যপ্রদেশে ভূটিয়াদিগের বাস, ইহারা অত্যন্ত দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী। কিন্তু আকৃতি বড় কুৎসিৎ। দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে ইহারা সর্ব্বদাই ভারবহন কার্য্যে নিযুক্ত। ইহারা এক এক জন অবলীলাক্রমে দুই মণ ভার পিঠের উপর লইয়া যায়। নেপালে বিদেশী লোকেরা প্রায় বাস করে না। কাটমণ্ডুতে বাণিজ্য ব্যপদেশে কাশ্মীরী মুসলমান ও মাড়বারীগণ বাস করেন। শীতঋতুর সমাগম হইতে না হইতে তিব্বত হইতে দলে দলে লোক ছাগল ভেড়া কম্বল লবণ কস্তুরি প্রভৃতি লইয়া কাটমণ্ডু উপত্যকায় উপস্থিত হয়। শীতকালে এখানে বাস করিয়া বসন্তের সমাগমে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নেপালে জাতিগত ভাষাগত আকৃতিগত এবং ধর্ম্মগত বৈষম্য অত্যন্ত অধিক। গুর্খাগণ হিন্দু আর্য্যবংশ সম্ভূত। তাঁহাদিগের পার্ব্বতীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ, দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হয়।

এই হেতু ভারতবর্ষীয়েরা অল্লায়াসে এই ভাষা আয়ত্ত করিয়া লয়। নেয়ারগণ আর্য্য এবং মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের ভাষা তির্ব্বতের সহিত জ্ঞাতি সম্বন্ধ প্রকাশ করে। সে ভাষা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য। পূর্ব্বে নেওয়ারগণ অধিকাংশ বৌদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু এখন হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার এরূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে যে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ আর নাই। মগর গুরুম হিন্দু। অন্যান্য জাতিসকলের ভাষা বিভিন্ন; তাহারা অধিকাংশই বৌদ্ধ। ভুটিয়া এবং লিম্বুরা তিব্বতীয় ভাষা ব্যবহার করে।

দাসত্ব প্রথা

নেপালে দাসত্ব প্রথা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহ 'ক্রীত' দাস দাসীতে পূর্ণ। কাহারও অবস্থা মন্দ হইলে দাস দাসী বিক্রয় করিবার রীতি আছে। দাস দাসীদিগের সন্তাণগণ জন্মের সহিত দাসত্বফাঁস গলায় করিয়া আসে। নেপালের দাসত্ব প্রথা ইউরোপীয়দিগের দাসত্ব প্রথার ন্যায় নহে। এখানে দাস দাসীগণের কোন কষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা সন্তান নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হয়। দাস হইতে দাসীর মূল্য অধিক—দাসীগণের ১৫০৲।২০০৲ এবং দাসগণের ১০০৲ ১৫০৲ পর্য্যন্ত মূল্য হইয়া থাকে। সুরূপা হইলে দাসীদিগের মূল্য অধিক হয়। দাসীগণ প্রভুর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলে তাহাদিগের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং চিরদিনের মত জীবিকার সংস্থান হয়।

ভুটিয়াগণ অতি সহজে আপনাদের সন্তান বিক্রয় করে। অনেক পিতা মাতা ঋণদায়ে সন্তান বন্ধক রাখে। ঋণ শোধ করিতে পারিলেই সন্তানদিগের দাসত্ব মোচন হয়।

নেপালে গণকঠাকুর এবং বৈদ্যের বিশেষ প্রতিপত্তি। নেপালে বিচারালয় আছে বটে কিন্তু বিচারের কোন পুঁথিলিখিত আইন আছে কি না জানিনা। সুবিচার সকল স্থলে না হইলেও মোটের উপর এক প্রকার বিচার হয়। গোহত্যা ব্রাহ্মণহত্যা করিলে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হয়। হত্যা-পরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরও মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচারের ব্যবস্থা আছে। নেপালে শিল্পবাণিজ্যের তদ্রূপ শ্রীবৃদ্ধি নাই। দেশে অত্যন্ত মোটা সুতার এবং মোটা পশমী বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। নেপালীগণ সচরাচর বিলাতি কাপড় ব্যবহার করে। নেপালে এক প্রকার কাগজ হয় তাহা সহজে ছেঁড়া যায় না। পিতল কাঁসার বাসন এবং হাতির দাঁতের মোটা কাজ ভিন্ন বিশেষ কোন শিল্পের প্রচলন নাই। স্বাধীন রাজ্যের এ বিষয়ে এরূপ দুরবস্থা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

নেপালের প্রধান তীর্থ

পশুপতিনাথ।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর ভারতবর্ষে পৌরানিক হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে। বৈদিক সময়ে দেব মন্দিরও ছিল না বিগ্রহ পূজাও ছিল না। এখন হরিদ্বার হইতে কুমারীকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কত তীর্থ কত মন্দির ও কতই বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। মহাত্মা শাক্য-সিংহ তাঁহার শিষ্যদিগের জন্য কোন প্রকার পূজা অর্চ্চনা যাগ যজ্ঞ, স্তব স্তুতির ব্যবস্থা দিয়া যান নাই। অথচ সেই বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ রূপান্তর হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অনেক তীর্থ এবং অনেক দেব মন্দির এক সময়ে বৌদ্ধদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্রাট অশোক যে ৮৪০০০ স্তুপ নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষা করিয়া ছিলেন। তাহার অধিকাংশ স্তুপই যে এখন দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় কি? নচেৎ সে সকল কোথায় অন্তর্হিত হইল? হিন্দুধর্ম্মের কবলে যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। বৌদ্ধদিগের বিহার, স্তুপ
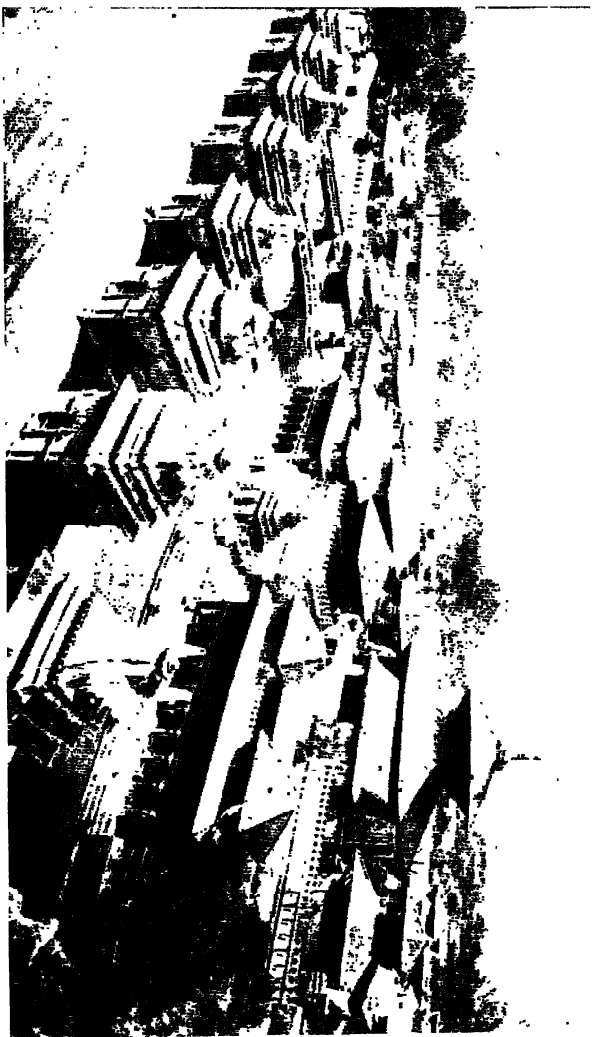
পশুপতিনাথের মন্দির

স্মৃতিচিহ্নসকল হিন্দুতীর্থ ও দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। পূরীর জগন্নাথ এবং নেপালের পশুপতিনাথ এই শ্রেণীর তীর্থ বলিয়া বোধ হয়। নেপালের ইতিহাসে পশুপতিনাথের জন্মকথা এইরূপ বিবৃত আছে। পুরাকালে নেপাল উপত্যকা বিশাল নাগবাস নামে হ্রদ ছিল। তথায় নাগকুল বাস করিত। সত্যযুগে বিপাশ্ব বুদ্ধ বন্দুমতি দেশ হইতে আসিয়া নাগবাসহ্রদের পশ্চিমে নাগার্জ্জুণ নামে পর্ব্বতে বাস করেন এবং হ্রদের জলে একটী পদ্মের মূল রোপণ করেন। তৎপরে তিনি শিষ্যগণকে. সেখানে রাখিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ যুগেই পদ্মের মূল হইতে শতদল বিকশিত হইল। এরং তন্মধ্যে স্বয়ম্ভু ভগবান প্রকাশিত হইলেন। এই বাণী শ্রবণ করিয়া শিখিবুদ্ধ আমরাপুরী হইতে আসিয়া সেই আলোকে বিলীন হইয়া যান। তৎপরে ত্রেতাযুগে বিশ্বভূ বুদ্ধ অণুপম হইতে আসিয়া ফুলচক পর্ব্বত হইতে জ্যোতি দর্শন করিয়া লক্ষ পুষ্পের অঞ্জলি দেন।

উক্ত ত্রেতা যুগে মঞ্জুশ্রী বুদ্ধ চীন দেশ হইতে আসিয়া দিব্য জ্যোতি দর্শন করেন। এবং তিনি তরবারীর আঘাতে কাটওয়ার নামক স্থান দিয়া হ্রদের জল বাহির করিয়া দেন। হ্রদের জলের সহিত নাগগণ বাহির হইয়া গেলে, তিনি কর্কটক নামে নাগরাজকে অনুরোধ করিয়া টাউদা নামক জলাশয়ে স্থাপন করিলেন; এবং উপত্যকায় সমুদায় ধন সম্পত্তির উপর তাঁহার আধিপত্য অপ্রতিহত হইল। তিনি বিশ্বরূপের মধ্যে স্বয়ম্ভূজ্যোতি দর্শন করিলেন। এবং বিশ্বরূপের ভিতর গুহ্যেশ্বরীকে দর্শন করিলেন।

পদ্মের মধ্যস্থিত স্বয়ম্ভুজ্যোতিকে পূজা করিলেন। এবং সেই পদ্মের মূল যে গুহ্যেশ্বরীতে নিহিত ছিল তাহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন। গৃহস্থ ব্যক্তিগণের বাসের জন্য তিনি মঞ্জুপাটন নামক সহর প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ভিক্ষুদিগের জন্য বিহারও স্থাপন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ধর্ম্মকরকে রাজা করিয়া তিনি চীনে প্রস্থান করিলেন। মঞ্জুশ্রীর শিষ্যগণ মঞ্জুশ্রীর পূজার জন্য স্বয়ম্ভূর নিকট এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

ত্রেতা যুগে করকচাঁদ বুদ্ধ ক্ষেমবতী নামক স্থান হইতে আগমন করিয়া স্বয়ম্ভুজ্যোতির ভিতর গুহ্যেশ্বরীকে দর্শন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ জাতীয় ৭০০ ব্যক্তিকে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা দেন। কিন্তু কোথায়ও আর জল দেখিতে পাইলেন না। তখন পর্ব্বত গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিবামাত্র বাঘমতি নদী নামিয়া আসিল। ৭০০ শিষ্যের কেশ লইয়া শূণ্যে ছড়াইয়া দিলেন অমনি কেশমতি নদীর জন্ম হইল।

দ্বাপর যুগে কণকমুণি বুদ্ধ শোভাবতী হইতে আসিয়া স্বয়ম্ভূ ও গুহ্যেশ্বরীর পূজা করেন। তৎপরে কাশ্যপ বুদ্ধ কাশী হইতে আগমন করেন। তিনিও স্বয়ম্ভূ ও গুহ্যেশ্বরীর পূজা করিয়া কৃতার্থ হন তৎপরে তিনি গৌড়ে (বাঙ্গালা) গিয়া প্রচণ্ডদেব নামক রাজাকে স্বয়ম্ভূ ও গুহ্যেশ্বরীর পূজা করিতে আদেশ দেন। তাঁহার আদেশানুসারে প্রচণ্ডদেব শান্তশ্রীনাথ নাম ধারণ করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বয়ম্ভুজ্যোতি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কিন্তু কলিযুগ সন্নিকট, জনিয়া

স্বয়ম্ভূজ্যোতিকে আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি মন্দিব নির্ম্মাণ করেন। কালে সেই স্বয়ম্ভূর মন্দির ধূলিসাৎ হয়, এবং স্বয়ম্ভূজ্যোতি ভগ্নাবশেষের ভিতর প্রোথিত হন। সকল চিহ্ন কালে বিলুপ্ত হইল। একদা এক গাভী নিত্য নির্জ্জণে বনেব মধ্যে তথায় আসিয়া দুগ্ধধারা সেচন করিতে থাকে। একদিন গোপালক পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গোপনে সমুদয় ব্যাপার দর্শণ করিল এবং কৌতূহল পরবশ হইয়া সে স্থান খনন করিতে আরম্ভ করে। এবং খনন করিতে করিতে সহসা স্বয়ম্ভূজ্যোতি প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন।

নীমুনি (যাঁহার নাম হইতে নেপাল নামের উদ্ভব) এই গোপালকের পুত্রকে রাজা করিলেন। এবং ইহারই রাজত্ব কালে পশুপতিনাথের পুনঃ প্রতিষ্টা হয়। পূরাকালে সেই স্বয়ম্ভূ বর্ত্তমান কালে এই পশুপতিনাথ। কিন্তু এখনও কাটমণ্ডু সহরের অদূরে স্বয়ম্ভূনাথের (স্বিম্ভূনাথের) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে নেপালে প্রায় ২৭৩৩টী দেব মন্দির আছে ; তন্মধ্যে পশুপতিনাথের মন্দির সর্ব্ব প্রধান। নেপালের উপত্যকায় কাটমণ্ডু সহরের প্রায় তিন মাইল উত্তরপূর্ব্বে বাঘমতি নদীয় পশ্চিমে পশুপতিনাথের প্রধান মন্দির অবস্থিত। বর্ত্তমান মন্দিরটী কতদিন নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে বৎসরের হিসাব না করিয়া শতাব্দীর হিসাব করিতে হয়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ধর্ম্ম নেপালেও

ম্লান হইয়া আসিয়াছে এবং সমুদায় বৌদ্ধস্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়া উক্ত দেবালয় মহাদেবের মন্দির হইয়াছে। বস্তুতঃ পশুপতিনাথের বিগ্রহে মহাদেবের কোন বিশেষত্ব দেখা যায় না। তবে মন্দিরের প্রাঙ্গনে, ত্রিশূল, বৃষ, শিবলিঙ্গ সকলই বর্ত্তমান। মন্দিরটী অতি সুদৃশ্য এবং উচ্চ। নেপালের সকল নৃপতি, সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, পশুপতিনাথের মন্দিরের কিছু না কিছু শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। নেপালরাজ সদাশিব দেব পশুপতিনাথের মন্দিরের ছাদ স্বর্ণ মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী, ভীমসেন থাপা কর্ত্তৃক পশুপতিনাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে সুবর্ণ মণ্ডিত একটী প্রকাণ্ড বৃষ স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কত যে স্বর্ণময় বৃষ, কত যে শিবলিঙ্গ আছে তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। পশুপতি নাথের মন্দিরে স্বর্ণ রৌপ্যের অতিশয় প্রাচূর্য্য দেখা যায়। ভারতের প্রায় অন্য সকল তীর্থ মুষলমানদিগের হস্তস্পর্শে হতশ্রী হইয়াছে। এই সকল তীর্থের ধন সম্পত্তি বারম্বার লুণ্ঠিত হইয়াছে—কেবল পশুপতিনাথ ইহার ব্যতিক্রম স্থল। নেপালে বুদ্ধ গিয়াছেন, অশোক গিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য গিয়াছেন, শিলাদিত্য গিয়াছেন, শঙ্কর গিয়াছেন, কেবল যান নাই মুসলমান দিগ্বিজয়ীগণ। বৌদ্ধ এবং হিন্দুগণ নেপালে অনেক কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন, অনেক দেবালয়, অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান হস্তে কোন দিন তাহা স্পৃষ্ট হয় নাই। স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দৃষ্টিপাতও করেন নাই। পশুপতিনাথের প্রভূত ঐশ্বর্য্য সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পূঞ্জীকৃতই হইতেছে, লুণ্ঠন করিতে কেহ আসে নাই। তাই

বোধ হয় অন্য কোন তীর্থে এরূপ স্বর্ণ রৌপ্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায় না। যে স্থানে পশুপতিনাথের মন্দিরটী প্রতিষ্টিত আছে, বস্তুতঃ তাহা অতি রমণীয়। পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকটে বহুদূর পর্য্যন্ত বাঘমতি নদীর উভয় পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত কত সোপান কত ঘাট,—গৌরী ঘাট, আর্য্য ঘাট, প্রভৃতি! পশুপতির ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিলে বাঘমতির দৃশ্য কি সুন্দর! উভয় পার্শ্বস্থিত উন্নত পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যেন কোন অদৃশ্য লোক হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া পুণ্য তোয়া নির্ঝরিণী কুল কুল করিয়া নামিয়া আসিতেছে। যেন ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে মন্দাকিণী নামিয়া আসিতেছে। অন্য সময় এই অপরিসর পার্ব্বত্য নদীর জল অতি অল্প থাকে কিন্তু বর্ষায় তাহার কি খরশ্রোত! কি কল্লোল! আর্য্যঘাটের পুলের উপর দাঁড়াইয়া বাঘমতির খরস্রোত ও কল্লোল দর্শন করিলে প্রাণ এরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, যে সেই খরস্রোতের মুখে লম্ফ দিয়া পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। বাঘমতির এই নৃত্যময়ী লীলা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না, এবং কল্লোলিনীর কল্লোল শুনিয়া শুনিয়া কর্ণ যেন আর তৃপ্ত হয় না। নেপালীদিগের নিকট পশুপতিনাথ অতি পবিত্র স্থান। মৃত্যুর সময়ে সকলে পশুপতি নাথের চরণ পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলকে মৃত্যুর পূর্ব্বে পশুপতিনাথে লইয়া যাওয়া হয়। পশুপতির ঘাটে দুইখানি প্রশস্ত শিলা এরূপ ভাবে নিহিত আছে যে তাহার উপর কাহাকেও শয়ন করাইলে পদদ্বয় বাঘমতির বারি স্পর্শ করে। এই শিলা-দুখানির একখানি রাজ পরিবার সকলের জন্য, অপরখানি মন্ত্রীর পরিবারের

সকলের জন্য। রাজা মহারাজা মহারাণী সকলেই অন্তিমে এই শিলা শয্যায় শায়িত হন ও বাঘমতির জলে চরণ রাখিয়া পশুপতিনাথের নাম জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। পূর্ব্বে এই স্থানেই সতীদাহ হইত। এখন পশুপতিনাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত মন্দির আছে, বিশ্বরূপের মন্দির, গুহ্যেশ্বরীর মন্দির ইত্যাদি অসংখ্য মন্দির।

গুহ্যেশ্বরীর মন্দিরে একটী উৎস আছে। সেই উৎসের মুখ স্বর্ণময় আবরণে আবৃত, খুলিয়া হাত দিলেই হস্তে উৎসের জল লাগে। গুহ্যেশ্বরীর মন্দিরে সর্ব্বদাই পূজা অর্চ্চনা চলিতেছে। পশুপতির প্রাঙ্গণে সাধু সন্ন্যাসীর অন্ত নাই কোথাও বা শাস্ত্রপাঠ হইতেছে, কোথাও ভজন গীত হইতেছে, কোথাও ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, কেহ বা পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে, কেহ বা মস্তকে পবিত্র বারি-সিঞ্চন করিতেছে। কেহ বা কপালে টীকা দিতেছে কেহ বা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে। দিবারাত্রি যাত্রীসমাগম দিবা-রাত্রি পূজাঅর্চ্চনা চলিতেছে। এই লোকারণ্যের মধ্যে স্থূলাকার বৃষ মহাশয় সগর্ব্বে বিচরণ করিতেছেন।

পশুপতিনাথের মন্দিরের অদূরে পর্ব্বতের উপরে মৃগাস্থলী নামক এক রমণীয় বন আছে। সেখানে বানরসকল দলে দলে বিহার করিতেছে। বৌদ্ধযুগে এই পশুপতিনাথের মন্দিরের সন্নিকটে বৌদ্ধবিহার বৌদ্ধমঠ সকল ছিল। এখন আর কিছুই নাই। পশু-পতিনাথের নিকট এখন যে সকল পল্লী আছে তাহা অতি কদর্য্য। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাথের মন্দিরে বিপুল

সমারোহ ব্যাপার হইয়া থাকে। সেই সময় প্রায় ২০,০০০ যাত্রী নানা দেশ বিদেশ হইতে পশুপতিনাথকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া থাকে এবং ছয় দিন নেপাল রাজ্যের দ্বার অবারিত থাকে। এই সময় পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় যাত্রিদল পশুপতিনাথের উদ্দেশে ধাবিত হয় এবং নেপাল উপত্যকায় পদার্পণ করিয়া "জয় পশুপতিনাথ" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠে। কি পথক্লেশ স্বীকার করিয়া লোক আসে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পশুপতিনাথ হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নেপালে প্রায় ২৭৩৩টী দেব মন্দির আছে। ইহার অধিকাংশ বিদেশীরা কখনও দেখিতে পায় নাই।

নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম

-:o:-

শাক্যসিংহের জীবদ্দশায় কিম্বা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। যে কুশীনগরে তিনি দেহত্যাগ করেন, তাহা নেপালের অন্তর্গত ছিল, ইহাও অনেকে প্রমাণ করিতে আয়াস করিয়াছেন। কুশীনগর নেপালের অন্তর্গত ছিল কি না তাহা নিশ্চিত প্রমাণীকৃত না হইলেও, শুদ্ধোদনের রাজ্য যে নেপালের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেখানে শাক্যসিংহ ভূমিষ্ঠ হন তথা হইতে নেপাল বহুদূর নয়, সুতরাং নেওয়ারদিগের কিম্বদন্তী অনুসারে শাক্যসিংহ সে রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে নেপালের অধিবাসীদিগের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ, অবশিষ্ট হিন্দু। হিমাচলের ক্রোড়স্থ অধিকাংশ পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহে—যথা নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মই লৌকিক ধর্ম্ম। কিন্তু নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মের যে বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি অপর কোন দেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ইহার তেমন সৌসাদৃশ্য নাই। হিন্দুধর্ম্মের সহিত অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে ইহা এক অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে। অতি পুরাকাল হইতে

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নেপালে ভারতবর্ষ হইতে নানাবিধ সম্প্রদায়ের লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই সঙ্গে অনেক ধর্ম্মমত, অনেক প্রকার আচার ব্যবহার এই দেশে প্রচারিত হইয়াছে। শুধু প্রচারিত হওয়া নয়, সর্ব্বধর্ম্মের এবং সর্ব্বজাতির এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বৌদ্ধ নেওয়ারগণের সহিত নেপালের আশ্রিত হিন্দুগণ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়েন এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধগণ অজ্ঞাতসারে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নেওয়ারদিগের ভিতর দুইটি সম্প্রদায় আছে,—বৌদ্ধমার্গী এবং শিবমার্গী। শিবমার্গিগণ প্রকৃত পক্ষে হিন্দু। গুর্খাগণের আগমনের পূর্ব্বেই নেপালে এই উভয় সম্প্রদায় ছিল। নেওয়ার রাজাগণ সকলেই প্রায় হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ প্রজাদিগের ধর্ম্মে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই, বরং অনেক সাহায্য করিতেন; তথাপি হিন্দু প্রজাগণই যে অধিকতর অনুগ্রহ এবং সহায়তা লাভ করিতেন, তাহাতে সংশয় নাই। বর্ত্তমান গুর্খারাজগণ বৌদ্ধপ্রজাদিগের ধর্ম্মে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা তাহাদের ধর্ম্ম অতি অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করেন; সুতরাং কি পুরাকালে কি বর্ত্তমান সময়ে নেপালের বৌদ্ধগণ কখনই বিশেষভাবে রাজপ্রসাদ লাভে সমর্থ হয় নাই। কেবল এই কারণেই নয়, নেপালের বৌদ্ধগণের দোষেই ঐ ধর্ম্ম এখন তথায় অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম তথায় শীঘ্রই লুপ্তধর্ম্ম হইবে।

বৌদ্ধদিগের ভিতর দুইটি প্রধান শাখা আছে,—মহাযান বা উত্তরদেশীয়, হীনযান বা দক্ষিণদশীয়। মহাযান সম্প্রদায়ই বোধ হয় এই নামের গৌরব স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, নতুবা হীনযান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশুদ্ধতা অধিক পরিলক্ষিত হয়। নেপালের বৌদ্ধদিগকে মহাযান বলিব কি হীনযান আখ্যা দিব তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অশোকের মহিমা এখনও তথায় ঘোষিত হয়, অশোকের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমন্দির সকল এখনও তথায় দণ্ডায়মান আছে; কিন্তু তিব্বতের সহিত নেপালের ধর্ম্মগত এবং বংশগত সৌহৃদ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মের আর এক বিশেষত্ব যাহা কুত্রাপি নাই তাহা এখানে আছে। নেপালের বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের ন্যায় বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। এইরূপ জাতিভেদ তিব্বতেও নাই, চীনেও নাই, সিংহলেও নাই। ইহা নেপালের নেওয়ারগণের মধ্যেই বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কারণেই নেপালের বৌদ্ধগণকে মহাযান বা হীনযান কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিতে পারিতেছি না। নেপালের বৌদ্ধদিগের ভিতর প্রচলিত বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি;—

বর্ণবিভাগ।

পূর্ব্বে যাহারা ভিক্ষু সন্নাসী—বিহারবাসী ছিল, এখন নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে তাহারা ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করিয়াছে; তাহারা "বাঁহরা" নামে অভিহিত হয়। "বন্দ্য" হইতে "বাঁহরা" নামের উৎপত্তি। বৌদ্ধদিগের মধ্যে ইহাই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বাঁহ্‌রাগণ অনেকস্থলে বিহারবাসী বটে, কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ভোগাসক্ত গৃহী হইয়াছে। তাহারা অধিকাংশই আমাদের দেশের স্বুবর্ণ-বণিকের কর্ম্মে নিযুক্ত। "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" বাদী বৌদ্ধগণের ভিতর ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিবার কোন জাতি নাই। বৈশ্যদিগের মধ্যে দ্বিতীয় জাতি "উদাসী" ইহারা সকলেই প্রায় ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত। চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও ইহারা বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিয়া থাকে। উদাসীগণ নেপা-লের বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধনিশ্রেষ্ঠ।

৩। "জাপু"—ইহারা শূদ্রদিগের ন্যায় কৃষিকর্ম্ম দাসবৃত্তি এবং নীচকার্য্যে লিপ্ত থাকে।

নেওয়ারদিগের ভিতর এই প্রধান তিনবর্ণ আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের সহিত আহার বিহার আদান প্রদান করে না, করিলে জাতিচ্যুত হয়। এই প্রধান তিন জাতি ভিন্ন আট প্রকার অস্পৃশ্য জাতি আছে। তাহাদিগকে নছুনি জাত বলে, অর্থাৎ তাহাদিগের জলগ্রহণ করা যায় না

বাঁহ্‌রাগণ ১। আরহান ২। ভিক্ষু ৩। শ্রাবক ৪। চৈলাক এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত।

উদাসীদিগের ভিতর ৭টি শ্রেণী আছে। জাপুগণ ৩০টি শাখায় বিভক্ত।

নেওয়ারদিগের এই বর্ণবিভাগ যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্মকে মলিন

এবং নিষ্প্রভ করিয়াছে এমন আর কিছুই নয়। নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের ইহাই প্রধান কারণ।

ধর্ম্মমত।

বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্র দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত,—আস্তিক এবং নাস্তিক। এক সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অন্য সম্প্রদায় আদিবুদ্ধ এই নামে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ জগতের স্রষ্টাপাতা বিধাতা পুরুষকে অভিহিত করে। আদিবুদ্ধ অনাদিকাল হইতে শান্তভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, অনন্তকাল এই ভাবেই স্থিতি করিবেন। আদিবুদ্ধ স্বয়ম্ভূ ভগবান্ আদিধর্ম্ম বা আদি প্রজ্ঞার (জড় শক্তির) সহিত মিলিত হইয়া এই বিচিত্র জগৎ রচনা করিয়াছেন। ইহাই নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ধর্ম্মমত। ইহারা মানবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। ইহা আদিবুদ্ধের অংশ এবং, সেই সত্তায় বিলীন হওয়াই মুক্তি বলিয়া বিবেচনা করে।

আদিবুদ্ধ ইচ্ছাক্রমে পঞ্চবুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন। আস্তিক নাস্তিক উভয় সম্প্রদায়ই আদিশক্তির ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহা ত্রিরত্ন নামে অভিহিত, যথা—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঙ্ঘ। এই ত্রিরত্নের মধ্যে আস্তিকেরা বুদ্ধের এবং নাস্তিকেরা ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। বুদ্ধ প্রাণ শক্তি অথবা চিৎধর্ম্ম জড়শক্তি এবং সঙ্ঘ উভয়ের মিলন সম্ভুত এই দৃশ্যমান্ জগৎ, কিন্তু অন্য এক অর্থে সকল সম্প্রদায়ই এই ত্রিরত্নের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; যথা—বুদ্ধ—শাক্যসিংহ, ধর্ম্ম—তাঁহার বিধি

বা শাস্ত্র, সঙ্ঘ অর্থাৎ সম্প্রদায় বা সাধকদল। এই ত্রিরত্নের সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে নেপালে এবং বৌদ্ধজগতে সর্ব্বত্রই একটি মধ্যবিন্দু সমন্বিত ত্রিকোণ ব্যবহৃত হয়। এই ত্রিকোণের অনেক প্রকার গুহ্যার্থ আছে। সাঙ্কেতিক "ওম্" শব্দে এই ত্রিরত্ন বৌদ্ধ-জগতে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধদিগের নিকট "ওম্" এই বাক্যের অর্থ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। সমুদায় বৌদ্ধজগতে "ওম্ মণিপদ্মে হুম্" বাক্যটি পদ্মপাণির পূজার মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু নেপালের পূর্ব্বতন রেসিডেণ্ট সুবিখ্যাত হড্সন্ সাহেব ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"সেই ত্রিরত্নের অন্তরে পদ্ম এবং মণি নিহিত আছে।" পদ্মের মধ্য স্থানে একটি মণি পদ্মপাণির চিহ্ন। পদ্মপাণির বৌদ্ধসঙ্ঘেরই মূর্ত্তি। এই মন্ত্র মহাযান সম্প্রদায়েরই বিশেষত্ব। সিংহল প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ এ মন্ত্র ব্যবহার করে না। নেপালে এই মন্ত্র সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। আস্তিক বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করে এক জন্মে না হউক জন্ম জন্মান্তরের পর বিশুদ্ধাত্মা ও নিষ্কাম হইয়া মানবাত্মা পরমাত্মা বা আদিবুদ্ধে বিলীন হইবে। এই জন্মান্তর বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্মের একটি মূলভাব। এই বিশ্বাসই "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই বাক্যের প্রণো-দক। এই হেতু জীবহিংসা বৌদ্ধশাস্ত্রে একান্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কি হইতে পারে যে, নেপালের বৌদ্ধগণ অতি নৃশংস উপায়ে সর্ব্বদা জীবহিংসা করিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভাব কিরূপে এরূপ ভাবে পদদলিত হয়, ইহাও

এক আশ্চর্য্য কথা। বৌদ্ধশাস্ত্রানুসারে পরলোকে স্বর্গভোগের ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধের স্বর্গ নির্ব্বান বা পরমাত্মায় বিলীন হওয়া। এই প্রকার মুক্তজীব বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধ নামে অভিহিত হয়।

বৌদ্ধ দেব দেবীগণ।

যে ধর্ম্মে কোন প্রকার পূজা অর্চ্চনা স্তব স্তুতির ব্যবস্থা নাই, সেই সাধনশীল ধর্ম্মেও অনেক দেব দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। আদিবুদ্ধ ইচ্ছাক্রমে পঞ্চবুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদিগের সহিত আদিবুদ্ধের পিতাপুত্রের সম্বন্ধ। ইঁহারা অমর বুদ্ধ বা দেববুদ্ধ। সে সকল মানবাত্মা স্বীয় চেষ্টায় জন্ম জন্মান্তরের পর নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও মানবীয় বুদ্ধ। ইঁহারা পূজার্হ বটেন, কিন্তু দেবতা নন। মহাযান সম্প্রদায়-ভুক্ত বৌদ্ধদিগের মতে শাক্যসিংহ স্বয়ং মানবীয় বুদ্ধদিগের মধ্যে শেষ ব্যক্তি। সেই অবধি অন্য কেহ বুদ্ধত্ব লাভে সক্ষম হন নাই। নিম্নে আদিবুদ্ধ হইতে যে পঞ্চবুদ্ধ প্রসূত হইয়াছেন তাঁহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

আদিবুদ্ধ।

বৈরচন অশ্বোভ রত্নসম্ভূ অমিতাভ অমোঘসিদ্ধ

আদিবুদ্ধের সহিত এই পঞ্চবুদ্ধের পিতা পুত্র সম্বন্ধ।

বৈরচন যেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা—সেই হেতু তিনি এবং চতুর্থ ভ্রাতা অমি-তাভ পদ্মপাণির পিতা বলিয়া অধিক পূজা লাভ করেন। এই

পঞ্চবুদ্ধ হইতে আবার বোধিসত্ত্বগণ প্রসূত হইয়াছেন। এখানেও পঞ্চবুদ্ধের সহিত বোধিসত্ত্বগণের পিতাপুত্র সম্বন্ধ। এই বোধিসত্ত্বগণকে জন্ম দিয়া পঞ্চবুদ্ধ আদিবুদ্ধে লীন হইয়াছেন। এই বোধিসত্ত্বগণই দৃশ্যমান্ জগতের সাক্ষাৎ কর্ত্তা। পঞ্চবুদ্ধের সহিত পত্নীভাবে পঞ্চবুদ্ধ-শক্তি মিলিত হইয়া পঞ্চ বোধিসত্ত্বকে জন্ম দিয়াছেন। নিম্নে পঞ্চবুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি এবং পঞ্চ বোধিসত্ত্বের তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

১। বৈরচন + বজ্রদন্তেশ্বরী—সামন্ত ভদ্র

২। অশ্বোভ + লোচনী—বজ্রপাণি

৩। রত্নসম্ভব + মামুখী—রত্নপাণি

৪। অমিতাভ + পানদারা—পদ্মপাণি

৫। অমোঘসিদ্ধ + তারা—বিশ্বপাণি

৬। ব্রজসত্ত্ব + বজ্রসত্ত্বামিকা—ঘণ্টাপাণি

নেপালে যে সকল বৌদ্ধ তান্ত্রিকসাধনপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা পঞ্চবুদ্ধের সহিত বজ্রসত্ত্ব যুক্ত করিয়াছেন। নেপালের বৌদ্ধদিগের তান্ত্রিকসাধন গ্রহণ হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবের অন্যতম প্রমাণ। তান্ত্রিকসাধনের সর্ব্বপ্রকার কুৎসিৎ অশ্লীলভাবও তাহারা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু গোপনভাবে এ সাধন সম্পন্ন হয় বলিয়া কদাচ কাহারো চক্ষে পড়ে না।

এই পঞ্চবুদ্ধ ভিন্ন সাতজন মানবীয় বুদ্ধ আছেন ; তন্মধ্যে শাক্যসিংহ শেষ।

নেপালের বৌদ্ধাদিগের মতে প্রথম তিন দেববুদ্ধ কার্য্যসমাধান

করিয়া আদিবুদ্ধে বিলীন হইয়াছেন। চতুর্থ বুদ্ধ অমিতাভের পুত্র পদ্মপাণি মৎস্যেন্দ্রনাথের উপর বর্ত্তমান জগতের ভার পড়িয়াছে। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেব দেবীগণের সাহায্যে জগতের তাবৎ কার্য্য পরিচালিত করিতেছেন। এইজন্য পদ্মপাণি মৎস্যেন্দ্র-নাথের নেপালের নেওয়ারদিগের নিকট এতাদৃশ সম্মান। অন্য সকল বুদ্ধ কেবল নামমাত্র আছেন; পদ্মপাণিই সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। পদ্মপাণির কার্য্য সমাধা হইলে তিনিও আদিবুদ্ধে লীন হইবেন।

নেপালের নেওয়ারগণ মানবীয় বুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য মানবীয় বোধিসত্ত্বের পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল মানবীয় বোধিসত্ত্বের মানবীয় বুদ্ধের সহিত পিতাপুত্রের সম্বন্ধ না হইয়া গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ। যে মহাত্মা চীন হইতে আগমন করিয়া নেপালে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই মাঞ্জুশ্রী এই শ্রেণীর বোধিসত্ত্ব। নেপালে মাঞ্জুশ্রীর অনেক মন্দির আছে; এবং পদ্মপাণির পরেই নেওয়ারদিগের হৃদয়ে ইঁহার আসন। এই সকল মানবীয় বোধি-সত্ত্বের নিম্নে আবার এক শ্রেণীর মানব আছেন যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞান, কঠোর সাধনা এবং পবিত্র জীবনদ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া-ছেন। তাঁহারা কেহ বা জীবিত আছেন, কেহ বা গতাসু হইয়াছেন। তিব্বতের লামাগণ এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহারা বুদ্ধের অবতার বলিয়া পূজিত হয়েন, কিন্তু লামাদিগের অবতারবাদ প্রকৃত বৌদ্ধশাস্ত্র মতে অসম্ভব ব্যাপার; কারণ, প্রকৃত বুদ্ধত্ব লাভ করিলে বা আদিবুদ্ধে লীন হইলে আর জন্মগ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু

বৌদ্ধগণ অন্য ভাবে লামাদিগের বুদ্ধত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, মানবজাতির উপকারের জন্য যে সকল বোধিসত্ত্ব বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন লামাগণ সেই শ্রেণীর অবতার। নেপালে তিব্বতের লামার বিশেষ সম্মান আছে বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত ঐ দেশের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

নেপালের বৌদ্ধশাস্ত্র।

তিব্বতের ন্যায় নেপালে বিস্তর প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ পাওয়া পাওয়া যায়। হড্‌সন্ সাহেব বিস্তর ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। নেপালের নেওয়ারদিগের দ্বারা এ সকল গ্রন্থ রচিত হয় নাই। তিব্বত হইতে আগত কোন লামা বা ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ সমাগত সাধু মহাত্মাদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় শঙ্কারাচার্য্য বিস্তর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ নেপালে দগ্ধ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিলে নেপালের চতুর্দ্দিকে এই সকল গ্রন্থ আজও পাওয়া যায়। গৃহস্থ এই সকল গ্রন্থ অত্যন্ত যত্নে রক্ষা করে। গৃহে অগ্নি লাগিলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া গ্রন্থ বুকে করিয়া পলাইয়া যায় এবং এই কারণেই এখনও নেপালে বৌদ্ধগ্রন্থ বিনষ্ট হয় নাই।

ধর্ম্মশাসন।

তিব্বতের লামার ন্যায় নেপালের বৌদ্ধদিগের উপর কোন ব্যক্তিবিশেষের অপ্রতিহত শক্তি নাই। গুর্খারাজগুরু তাহাদিগের বর্ণসম্বন্ধীয় সমুদায় বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমুদায় মীমাংসা বাঁহরাগণ সম্মিলিত ভাবে করিয়া থাকেন। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সামাজিক ভাবে তাহার প্রতিবিধান হইয়া থাকে; ইহাকে নেওয়ারগণ "গতি" বলে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে।

১। প্রত্যেক গৃহস্থকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বজাতীয়গণকে ভোজ দিতে হয়। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইলেও ইহার অন্যথা হইবার নহে।

২। স্বজাতি কাহারও মৃত্যু হইলে প্রত্যেক পরিবার হইতে এক একজন ব্যক্তিকে মৃতের সৎকার এবং শ্রাদ্ধাদিতে যোগ দিতে হয়।

গতির নিয়ম অগ্রাহ্য করিলে অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। গুরুতর সামাজিক অপরাধ করিলে তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয়। জাতিচ্যুতকে আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। তাহার মৃতদেহের সৎকার কেহ করে না। ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি আর কি হইতে পারে? সুতরাং নেওয়ারদিগের ভিতর সামাজিক শাসনের নিয়ম নিতান্ত শিথিল নহে।

নেপালের বৌদ্ধমন্দির।

বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মস্থান এবং প্রধান লীলা ভূমি ভারতবর্ষ হইতে বহু শতাব্দী হইল উক্ত ধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। একটীও বিশুদ্ধ বৌদ্ধমন্দির ভারতের কুত্রাপি আর দেখা যায় না। লুম্বিনী, কপিলাবাস্তু, গয়া, কুশীনগর, সকলই শ্মশান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতবাসী আর সেখানে তীর্থ যাত্রা করে না। এক সময়ে যেখানে সহস্র সহস্র বিহারমন্দির ছিল এখন তাহা সমভূমি; হয় ত শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে। কিন্তু নেপাল-উপত্যকায় পদার্পণ করিলে সহসা যেন দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের ছবি নয়নপথে উদ্ঘাটিত হয়। যে ধর্ম্ম ভারতবর্ষে এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছে তাহা দুর্গম নেপালরাজ্যে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালাবেষ্ঠিত অপূর্ব্ব শোভাময় বিচিত্র প্রদেশে, এখনও জনসাধারণের প্রধান ধর্ম্ম। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে উহা ত সম্পূর্ণ রূপেই বৌদ্ধভূমি ছিল। চীন, জাপান, তীব্বত, ব্রহ্মদেশে যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীয়মান আছে নেপালে একদিন তাহাই ছিল। এখন নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের হীনতার একশেষ হইলেও একেবারে তিরোধান হয় নাই। নেপাল-উপত্যকায় পদার্পণ করিলে সহস্র সহস্র বৌদ্ধমন্দির দৃষ্টিগোচর হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পশুপতিনাথের মন্দির হয় ত এক সময় বৌদ্ধমন্দির ছিল,

কিন্তু এখনও নেপালে অত্যন্ত প্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধমন্দির সকল অতি সুন্দর অবস্থায় আছে। এই সকল বৌদ্ধমন্দির তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ;—

১। কতকগুলি আদিবুদ্ধের নামে উৎসর্গীকৃত।

২। কতকগুলি কোন বোধিসত্ত্ব মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন।

৩। অধিকাংশ মন্দির কোন মৃত মহাত্মার দেহাবশেষ বা চিতাভস্ম রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে।

কাটমণ্ডু সহরের অদূরে স্বয়ম্ভূনাথের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নেওয়ারদিগের অতি পবিত্র তীর্থ। নেপালের ইহা প্রাচীনতম মন্দির বলিলেও চলে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, এই রূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কাটমণ্ডু সহরের এক মাইল পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিখরদেশে স্বয়ম্ভূনাথের বা আদিবুদ্ধের এই প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। নেপাল উপত্যকা হইতে এই পর্ব্বতটী প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ হইবে।

কথিত আছে মাঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব যখন নাগবাস হ্রদের জল নির্গত করিয়া দেন তখন হ্রদে একটী শতদলের মধ্যে স্বয়ম্ভূ ভগবান্ দিব্য-জ্যোতিতে প্রকাশিত হইলেন। সেই পদ্মের মূল পশুপতিনাথের নিকটবর্ত্তী গুহেশ্বরীতে নিহিত ছিল, এবং পুষ্পটীর উপর বর্ত্তমান স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরের অদূরে মাঞ্জুশ্রীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালে মাঞ্জুশ্রীর অনেক মন্দির আছে। অনেক স্থলে বুদ্ধের চরণ এবং মাঞ্জুশ্রীর চরণ মন্দিরে

সিম্ভু অর্থাৎ সয়ম্ভুনাথের মন্দির

অঙ্কিত দেখা যায়, ম্যাঞ্জুশ্রীর চরণে চক্ষু ও বুদ্ধের চরণে চক্র দেখা যায়। উপত্যকা হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী দিয়া পর্ব্বতশিখরে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে উঠিতে হয়। এই সোপানশ্রেণী অতিক্রম করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সোপানশ্রেণীর পাদদেশে বুদ্ধদেবের প্রস্তরনির্ম্মিত ধ্যানমগ্ন এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বামে ধর্ম্ম এবং দক্ষিণে সঙ্ঘের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে। ১৬৩৭ সালে এই বুদ্ধমূর্ত্তি নেপালরাজ প্রতাপমল্ল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সোপানাবলীতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে পথের উভয় পার্শ্বে সর্পোপরি গরুড়ের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড়ের মস্তকে বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি আছে। হিন্দুদিগের উপাস্য গরুড় বুদ্ধের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মন্দিরের দ্বাররক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই ভাবেই অনেক বৌদ্ধমন্দিরে গরুড় গণেশ প্রভৃতি হিন্দু-দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধগণ পূর্ব্বের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া হিন্দু-দেবদেবীগণের পূজা করিয়া থাকেন। সোপানাবলী দিয়া উঠিয়াই মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড স্বর্ণবর্ণের বজ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও নেপালরাজ প্রতাপমল্ল কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধমন্দিরে বজ্রের সার্থকতা কি তাহা প্রথমে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বজ্রটী ইন্দ্রের, বুদ্ধকর্ত্তৃক হিন্দু-দেবতা ইন্দ্রের পরাজয়ের চিহ্নস্বরূপ আদিবুদ্ধের মন্দিরের দ্বারদেশে বজ্রটী স্থাপিত হইয়াছে। বজ্রের সম্মুখে স্বয়ম্ভুর মন্দির ; কিন্তু ইহাকে মন্দির বলিলে ঠিক্ হইবে না, ইহা মন্দির নয়, প্রকাণ্ড স্তূপ।

এই স্তূপের চারিদিকে সুন্দর মন্দির আছে বটে। তাহার কোনটা বা বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধ কোনটা বা বৈরচন, কোনটা বা অমিতাভ প্রভৃতির মন্দির। প্রাঙ্গনে বৌদ্ধভিক্ষুদিগের জন্য বিহার সকল দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘণ্টা।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধদিগের জপযন্ত্র বা মণি আছে। দর্শকগণ ঘণ্টাধ্বনি করিয়া এবং জপযন্ত্র ঘূরাইয়া পূজার ফল লাভ করে। স্বয়ম্ভূ অদ্যাবধি বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ। নেপালে শীতকালে বিস্তর তিব্বতবাসীর সমাগম হয়। তাঁহাদিগের নিকট স্বয়ম্ভূ অতি পবিত্র স্থান। নেপালবাসী নেওয়ারগণ সর্ব্বদা স্বয়ম্ভূনাথ দর্শন করিতে আসে বটে, কিন্তু হিন্দুদিগের নিকট এ স্থানের বিশেষ কোন সম্মান নাই। পশুপতিনাথের মন্দিরে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই গিয়া থাকে। এখানে জনসমাগম নাই বলিলেও হয়। প্রাঙ্গন প্রায় জনশূন্য দেখিলাম। বানরদল আনন্দে বিহার করিতেছে। স্বয়ম্ভূর মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন। কথিত আছে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নেপালরাজ গোরাদাস ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের নিকট প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ হইতে কোন্ সময়ে কোন্ মহাত্মা এই মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা যায়; যথা—

১। ১৫৯৬ সালে নেওয়াররাজ শিবসিংহমল্ল ইহার পূর্ণ-সংস্কার করেন।

২। ১৬৩৯ সালে লাসা হইতে আগত সিয়া মা নামে জনৈক লামা ইহার পুনঃসংস্কার করেন।

৩। ১৬৫০ সালে নেওয়াররাজ বিখ্যাত প্রতাপমল্ল আদি-

বৌদ্ধস্তূপ-বোধ
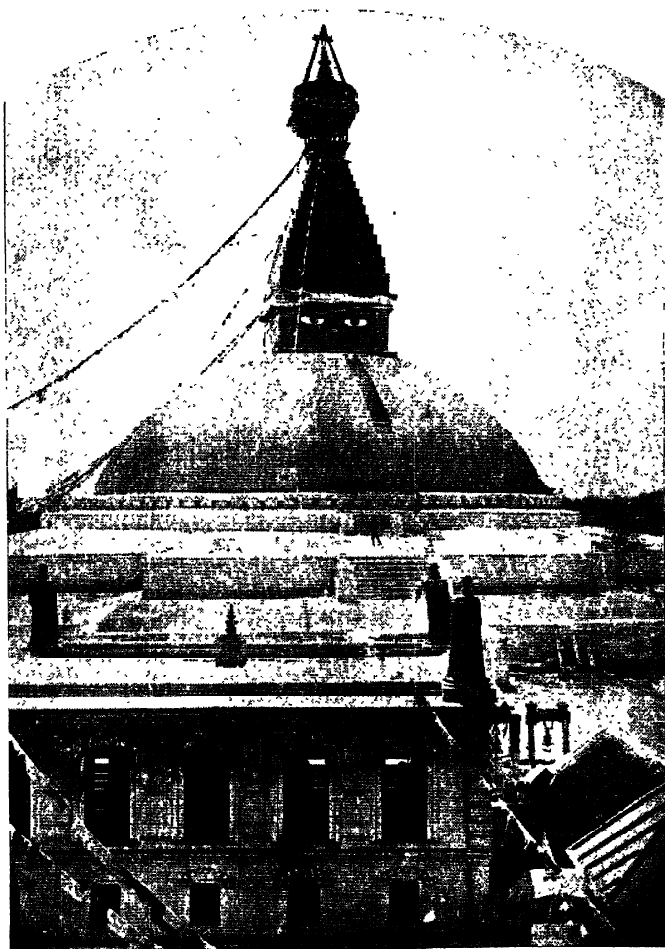
স্তূপের চারিদিকে পাঁচটী অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত করিয়া পঞ্চ-বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। ১৭৫০ সালে লাসা হইতে দুইজন লামা আসিয়া এই মন্দিরের সংস্কার করেন। ইহার পরও অনেক বার অল্লাধিক পরিমাণে ইহার সংস্কার হইয়া আসিতেছে। জানি না এই রূপ প্রাচীন মন্দির আর আছে কি না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও ইহার অবস্থা ভালই আছে।

বোধনাথ বা বৌধ

কাটমণ্ডু সহরের তিন মাইল দূরে তিব্বতবাসী বৌদ্ধদিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ বোধনাথ প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ম্ভূর মন্দিরে হিন্দুগণ কদাচিৎ গিয়া থাকে; কিন্তু বোধনাথ খাঁটি বৌদ্ধতীর্থ। তিব্বতি-গণ ইহার চতুর্দ্দিকে বাস করে। ইহা তাহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগেরই তীর্থ। ইহাও অতি প্রাচীন। অতি পুরাকালে লাসা হইতে কাশ নামে কোন তিব্বতী তীর্থভ্রমণোদ্দেশে নেপালে আগমন করেন, তাঁহারই দেহাবশেষ এই স্তূপের গর্ভে রক্ষিত হইয়াছে; ইহাও প্রকাণ্ড গোলাকার এক স্তূপ। ইহার ব্যাস ৯০ ফিট্ এবং মধ্যভাগ উচ্চে ১৫৩ ফিট্ হইবে। নেপাল-উপত্যকার সর্ব্বত্রই ইহার স্বর্ণময় চূড়া এবং তন্নিম্নস্থিত চক্ষুদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকাণ্ড স্তূপটীর চতুর্দ্দিকেও জপযন্ত্র। ইহা তিব্বতীদিগের একটী ক্ষুদ্র সহর এবং অপরিচ্ছন্নতায় অতুলনীয়। বোধনাথের সহিত হিন্দুদিগের কোন সম্পর্ক নাই; তাহারা ইহার ত্রিসীমানায় পদার্পণ করে কি না সন্দেহ।

৩। পাটনে মৎসেন্দ্রনাথের মন্দির।

নেপালের নেওয়ারগণ মৎসেন্দ্রনাথকে বোধিসত্ত্ব পদ্মপানির অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। কথিত আছে আসামের কথপল পর্ব্বত মৎসেন্দ্রনাথের আবাস ছিল। একবার নেপালে দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। তখন ভাটগাঁওএর রাজা নরেন্দ্রদেব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনেন এবং তাঁহার আগমনমাত্রে নেপালে প্রচুর বারিবর্ষণ হয় এবং প্রজাগণের প্রাণরক্ষা হয়। অদ্যাবধি মৎসেন্দ্র-নাথের যাত্রার দিবস এক পসলা বৃষ্টি না হইয়া যায় না। এই মন্দির পাটনের দক্ষিণে নরেন্দ্রদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৪। কাটমণ্ডু সহরে ছোট মহেন্দ্রনাথের মন্দির আছে।

পাটনে অশোকের মন্দির।

নেপালের ইতিহাসে দেখা যায় সম্রাট অশোক সপরিবারে সদলে নেপালে আগমন করেন। কাটমণ্ডু সহরের সন্নিহিত পুরাতন পাটন, অর্থাৎ ললিত পাটন তাঁহাদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সহরের মধ্যভাগে এবং চারিকোণে আদিবুদ্ধের যে সকল মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা অদ্যাবধি সুন্দর অবস্থায় আছে। এই সকল মন্দিরের গর্ভে অশোক যাহা নিহিত করিয়া-ছিলেন তাহা অদ্যাবধি কেহ স্পর্শ করে নাই। জানি না ভবিষ্যতে এই সকল মন্দিরের গর্ভ হইতে কত অমূল্য পুরাতত্ত্ব সংগৃহীত হইবে।

ভাটগাঁওএ অশোকের প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে। কীর্ত্তিপুরে এবং ভাটগাঁওতে অসংখ্য বৌদ্ধমন্দির আছে। ইহার কোনটা বা আদি-

বুদ্ধ, কোনটা বা মাঞ্জুশ্রী, কোনটা কোন বোধিস্বত্বের উদ্দেশে উৎসর্গী-কৃত হইয়াছে। সংকীর্ণ স্থানে তাহার বর্ণনা এবং উল্লেখ করা দুঃসাধ্য। এরূপ অসংখ্য বৌদ্ধকীর্ত্তি ভারতে আর কুত্রাপি নাই। নেপাল বৌদ্ধদিগের অতি প্রিয়ভূমি তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নেপালের পূজা পার্ব্বণ ও জাতীয় উৎসব

বাঙ্গালা দেশে আমরা বারমাসে তের পার্ব্বণ দেখিয়া আসিতেছি, এখানে ১২ মাসের পূজা পার্ব্বণের সংখ্যা করিয়া উঠাই এক কঠিন ব্যাপার। কি গুর্খা, কি নেওয়ার, নেপালীদিগের ভিতর চির উৎসব চলিয়াছে। এত পূজা পার্ব্বন, আমোদ আহ্লাদ করিয়া কখন যে তাহারা জীবিকা উপার্জ্জনের অবসর পায় তাহাই ত এক সমস্যা। গুর্খাগণ হিন্দু, নেওয়ারগণ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল। এই উভয় সম্প্রদায়ের উৎসব এখন নেপালের জাতীয় উৎসব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণেই নেপালে পূজা পার্ব্বণের এত বাহুল্য দেখা যায়। বৌদ্ধদিগের দেবমন্দির হিন্দুদিগেরও দেবমন্দির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৌদ্ধদিগের উৎসব হিন্দুদিগেরও উৎসব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজয়াদশমী, হিন্দুর উৎসব হইলেও নেপালের আপামর সাধারণের তাহাই এখন প্রধান জাতীয় উৎসব।

১। ১লা বৈশাখ হইতে নেপালীদিগের উৎসব আরম্ভ। সেই দিন ভোগমতিগ্রামে নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৎসেন্দ্রনাথের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং রাজার তরবারি তাঁহাকে দেওয়া হয়। অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে উচ্চ বিচিত্র বর্ণের পতাকাশোভিত কাঠের রথে বসাইয়া তাঁহাকে পাটনে আনা হয়। আসিবার সময় পথে বিস্তর জনসমাগম হয় এবং পথে এক একদিন এক

একস্থানে মৎসেন্দ্রনাথের অবস্থিতি হয়। সেই দিন সেই স্থানের লোকেরা মৎসেন্দ্রনাথের সেবকদিগের সেবা করেন। এই প্রকারে প্রায় ৭ দিন ধরিয়া মৎসেন্দ্রনাথের যাত্রাকার্য্য সম্পন্ন হয়। পাটনে এক মাস অবস্থিতি করিয়া পুনরায় শুভদিন দেখিয়া মৎসেন্দ্রনাথ ভোগমতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই মহেন্দ্রনাথের যাত্রা বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের উৎসব। এখন ইহাতে সর্ব্বসাধারণে যোগ দিয়া থাকে।

২। ৩রা বৈশাখ হইতে ব্রজযোগিনী যাত্রা আরম্ভ হয়। কাটমণ্ডুর সন্নিকটে মুনিচর পর্ব্বতে এই ব্রজযোগিনী দেবীর মন্দির অবস্থিত। প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেবীকে এই সময় ক্ষুদ্র কাষ্ঠমন্দিরে স্থাপন করিয়া সকলে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ইহাও নেওয়ার-দিগের উৎসব।

৩। ২১শে জ্যৈষ্ঠ সিবি যাত্রা—এই দিবসে কাটমণ্ডু সহরের পশ্চিমাংশে বিষ্ণুমতী নদীর তীরে বালকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নদীর উভয় পারে থাকিয়া পরস্পরকে প্রস্তরখণ্ড মারিতে থাকে। পূর্ব্বে এই পর্ব্বোপলক্ষে জীবননাশ, অঙ্গহানি পর্য্যন্ত ঘটিত। এক-বার ইংরাজ-রেসিডেণ্ট এই উৎসব দেখিতে আসিয়া দৈবাৎ গুরুতর আহত হন। তখন হইতে জঙ্গ বাহাদুর ইহাকে সংযত করিয়া এখন বালকদিগের ক্রীড়ামাত্রে পরিণত করিয়াছেন। এখন গুরুতর দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে না।

৪। ঘাটে মঙ্গল—১৪ই শ্রাবণ নেপালের বালকগণ ঘাটা-

সুরের কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে বাজারে প্রদক্ষিণ করে। সকলে পড়িয়া তাহাকে উত্তমরূপ প্রহার করে এবং সকলের নিকট ধান্য ভিক্ষা করে। সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে উক্ত অসুরের দাহকার্য্য সমাধা হয়। এই প্রকারে দেশ হইতে ঘাটাসুরের বিদূরণ ব্যাপার সমাধা হয়। ইহা বালকদিগেরই উৎসব।

৫। বাঁহরাযাত্রা—ইহা একেবারে নেওয়ারদিগের উৎসব এবং নেওয়ারগণ কর্ত্তৃক বৎসরে দুইবার সম্পন্ন হইয়া থাকে ; যথা—৮ই শ্রাবণ এবং ১৩ই ভাদ্র। বৌদ্ধমার্গী নেওয়ারদিগের মধ্যে পুরোহিত অর্থাৎ ভিক্ষুকসম্প্রদায় বর্ত্তমান সময়ে বাঁহরা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখন বৌদ্ধধর্ম্মের দুর্গতির আর বাকী কিছু নাই। ভিক্ষুদিগের ভিক্ষাব্রত আর নাই। কিন্তু এই দুই দিবস তাহাদিগের পূর্ব্বব্রত স্মরণের দিন। এই দুই বিশেষ দিনে নেওয়ারগণ তাহাদিগের গৃহ বিপণি উত্তম রূপে সজ্জিত করে। নারীগণ গৃহদ্বারে ভাণ্ডপূর্ণ চাউল লইয়া বসিয়া থাকে। বাঁহরাগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের ভিক্ষাব্রত স্মরণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হয়। নারীগণ সকলকে ভিক্ষা দিয়া কৃতার্থ হয়। নেওয়ারগণ সময়ে সময়ে এই উৎসবে রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে রৌপ্যময় সিংহাসন সুবর্ণ-ছত্র প্রভৃতি উপহার দিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের ইহা এক মহা উৎসব।

৬। রাখীপূর্ণিমা—শ্রাবণের সংক্রান্তিতে এখানে রাখিপূর্ণিমার উৎসব হয়। এই উৎসবে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই যোগ দিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণ এই দিবসে নদীতে স্নান এবং দেবতা দর্শন

করেন। ব্রাহ্মণগণ সকলের হস্তে রাখী বন্ধন করে। এবং প্রতি-দানে বিস্তর দক্ষিণা লাভ করে। অনেকে এই সময়ে গোঁসাইথান নামক হিমালয়ের উন্নত শিখরে ভ্রমণ করে।

৭। নাগপঞ্চমী—৫ই শ্রাবণ নাগপঞ্চমীর পূজা সম্পন্ন হয়। এই দিবস নাগযুদ্ধে গরুড় জয়লাভ করিয়াছিল। পাটনে চন্দ্র-নারায়ণ নাম্নে গরুড়ের যে প্রস্তর মূর্ত্তি আছে এই দিবসে তাহা ঘর্ম্মাক্ত হয়। পুরোহিতগণ একখণ্ড কাপড়ে সেই ঘর্ম্ম মুছিয়া রাজার নিকট প্রেরণ করে। লোকের বিশ্বাস সর্পাঘাতগ্রস্ত রোগী-কে এই কাপড়ের একটী সূতা জলে ডুবাইয়া পান করাইলে সর্পবিষ স্খালিত হয়।

৮। জন্মাষ্টমী—ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে এই উৎসব হইয়া থাকে। জনসাধারণ এই দিবসে আপন আপন গৃহ সুসজ্জিত করে।

৯। গাইযাত্রা—ভাদ্রমাসের প্রথম দিবসে এই পার্ব্বণ হয়। ইহা নেওয়ারদিগের মধ্যেই প্রচলিত। বৎসরের মধ্যে যাহাদিগের গৃহে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে তাহারাই এই পার্ব্বণে যোগ দিয়া থাকে। এই দিবসে কোন ব্যক্তিকে সেই মৃত ব্যক্তির ন্যায় সজ্জিত করিয়া তাহাকে চতুষ্পদ বিশিষ্ট করিয়া রাজার বাড়ীতে লইয়া নৃত্য করে। ইহা এক অপূর্ব্ব উৎসব। স্বয়ং মহারাণীর মৃত্যু হইলেও তাঁহার এক গাভীমূর্ত্তি এই দিবসে করা হয়। এই মূর্ত্তিকে রাজ্ঞীর ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া চতুষ্পদবিশিষ্ট করে।

১০। বাঘযাত্রা—ইহাও ভাদ্রমাসে হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র-

মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া লোকেরা বাড়ী বাড়ী নৃত্য করিয়া আমোদ করিয়া বেড়ায়।

১১। ইন্দ্রযাত্রা—২৬শে ভাদ্র নেওয়ারদিগের মধ্যে এই মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই দিবসে একটী উচ্চ কাঠের স্তম্ভ রাজার বাটীর সম্মুখে রোপণ করা হয়। তখন সকলে নানাপ্রকার মুখোস্ পরিয়া ইহার চারিদিকে নৃত্য করে। তৃতীয় দিবসে কয়েকটী কুমারীকে রাজার সম্মুখে আনিয়া পূজা করা হয়। কুমারীগণ পূজিত হইলে তাহাদিগকে রথে বসাইয়া সহর প্রদক্ষিণ করা হয়। সহর প্রদক্ষিণানন্তর রাজবাটীর সম্মুখে রথ উপনীত হইলে রাজার গদি কুমারীদিগের সম্মুখে বিস্তৃত করা হয়। কখন কখন রাজা তদুপরি স্বয়ং উপবেশন করেন। রাজার অবর্ত্তমানে তাঁহার তরবারি তদুপরি রক্ষিত হয়। ইন্দ্রযাত্রা নেওয়ারদিগের চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এই দিবস পৃথ্বীনারায়ণ গুপ্তভাবে কাঠমণ্ডু সহরে কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নেওয়ারগণ এই উৎসবে এত মত্ত ছিল যে, তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই। কুমারীগণ সহর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে যখন রাজার গদি বিস্তৃত হইল, তখন পৃথ্বীনারায়ণ স্বয়ং তাহাতে উপবেশন করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

১২। দশমী বা দুর্গোৎসব—বঙ্গদেশে যেমন দুর্গোৎসব হইয়া থাকে সেরূপ এখানেও হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ইহাই নেপালের জাতীয় উৎসব। নেপালের সমুদায় জনসাধারণ

মনপ্রাণের সহিত এই উৎসব-কার্য্যে যোগ দিয়া থাকে। বঙ্গদেশের ন্যায় এখানে দেবীর প্রতিমা নির্ম্মিত হয় না। সপ্তমীর দিনে সমুদয় সৈন্য ব্যূহাকারে টুনিখেলে সজ্জিত হয়। স্বয়ং রাজা, মন্ত্রী ও সমুদায় গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত হন। রাণী পখরীর মন্দিরে যেমন নারীগণ ঘটস্থাপন করেন অমনি দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া ভীমগর্জ্জনে সমুদায় বন্দুক, কামান ধ্বনিত হইয়া উঠে এবং দশমীব উৎসব আরম্ভ হয়। দরিদ্র ধনী সকলের গৃহে গৃহে ছাগ মহিষ বলি দেওয়া হয়! নেপালে দশমীর উৎসবের এই প্রধান অঙ্গ। এই সময়ে গৃহে গৃহে পথে হাটে ঘাটে সর্ব্বত্রই বলি, সর্ব্বত্রই রুধিরোৎসব; স্বয়ং রাজা মহারাজা প্রভৃতি স্বহস্তে বলি দিয়া থাকেন। অষ্টমী ও নবমীতে সহস্র সহস্র ছাগ এবং মহিষ দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়। এই সকল পশু অধিকাংশই বহুদিন পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হয়। দশমীর দিন উৎসবের অবসান। সেই দিন সকলে নববস্ত্র পরিধান করিয়া আত্মীয় স্বজনের গৃহে সমাগত হয় এবং গৃহস্বামী সকলের কপালে টীকা দেন। সেই দিন রাজকর্ম্মচারিগণ রাজগৃহে সমাগত হয়, তাঁহাকে অর্থ দিয়া দর্শন করে এবং তিনি সকলের কপালে টীকা দিয়া আপ্যায়িত করেন।

৩। বঙ্গদেশের ন্যায় এখানেও শ্যামাপূজার সময় গৃহসকল আলোকমালায় সজ্জিত হয়; কিন্তু শ্যামা পূজা হয় না, লোকে করে এবং সমস্ত রাত্রি জুয়া খেলে। এই সময়

তিনদিন নেপালীগণ উন্মত্তের ন্যায় পথে ঘাটে জুয়া খেলিয়া বেড়ায়।

১৪। ১৬ই কার্ত্তিক নেপালীদিগের কুকুরপূজার দিন। সে দিন পথে ঘাটে দেখি কুকুরের গলায় মাল্য, কপালে টীকা। ৩৬৪ দিন তাহারা সর্ব্বত্র প্রহারদ্বারা অভ্যর্থিত হয়; কিন্তু এই একটী দিবস তাহারা সমাদর, আহার, পূজা সকলই লাভ করে। বোধ হয় "অহিংসা পরমোধর্ম্মবাদী" বৌদ্ধগণ জীবগণের প্রতি প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই উৎসবের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন।

১৫। ভাইপূজা—আমাদের দেশে যেদিন ভগিনীগণ ভাইএর কপালে ফোঁটা দেন সেই দিনই নেপালী-সুন্দরীগণ ভাইপূজায় প্রবৃত্ত হন। ইহা রীতিমত ভাইপূজার ব্যাপার—জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও এই দিবস পূজা করেন এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন আহার করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন।

১৬। বালচতুর্দ্দশী—এই দিবসে বানরদিগের উৎসব। পশুপতিনাথের নিকটস্থ মৃগস্থলী নামক বনে গিয়া সকলে চাউল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করে। বানরেরা আসিয়া আনন্দে আহার করে।

১৭। কার্ত্তিক পূর্ণিমা—এই দিবস নেপালের সধবা সুন্দরীগণ উপবাস করেন এবং সকলে পশুপতিনাথ দর্শন করিতে আসেন। পরদিন প্রাতে স্বামীর চরণ পূজা করিয়া জলগ্রহণ করেন। ইহার অপর নাম তীজব্রত।

১৮। গণেশ চৌথ—৪ঠা মাঘ উপবাসান্তে সকলে উত্তম আহার করিয়া থাকে।

১৯। বসন্ত শ্রীপঞ্চমীর উৎসব।

২০ মাঘীপূর্ণিমা—যাঁহারা সমুদায় মাঘমাস বাঘমতীর জলে অবগাহন করিয়া স্নান করেন, তাঁহাদিগকে সংক্রান্তির দিন ডুলিতে করিয়া দেব মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহাদের বক্ষে, হস্তে, চরণে প্রজ্বলিত প্রদীপ দেওয়া হয়। নেপালের দুরন্ত শীতে বাঘমতীর হিম জলে অবগাহন বড় সহজ ব্যাপার নহে।

২১। হোলি বা বসন্ত উৎসব—ফাল্গুনের সংক্রান্তির দিনে রাজবাটীর সম্মুখে একটা কাষ্ঠের স্তম্ভে নানাবিধ পতাকা প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। নেপালে হোলি রাজবাটীরই উৎসব। সকলে শুভ্র বসন পরিধান করিয়া রাজবাটীতে গমন করেন। সেখানে সকলে সকলকে ফাগ দিয়া রঞ্জিত করে। স্বয়ং রাজাধিরাজ মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মহোৎসাহে ফাগ খেলা করেন। সাধারণ লোকে ফাগ খেলা করে না। রাজবাটীতেই ফাগখেলার স্থান।

২২। ১৫ই চৈত্র ঘোড়াযাত্রা—এই দিবস রাজা মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ টুনিখেলে সমবেত হন এবং তাঁহাদের সম্মুখে ঘোড়দৌড় হয় এবং নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শিত হয়। ঘোড়াযাত্রার পর নেপালীগণ দুই দিন জুয়া খেলায় মত্ত হয়। এই সময়ও দীপান্বিতা ভিন্ন অন্য সময় জুয়া খেলিলে দণ্ডার্হ হইতে হয়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

নেপালের প্রাকৃতিক বিবরণ।

নেপাল হিমাচলের ক্রোড়স্থ পার্ব্বত্য রাজ্য—ইহা হিমাচলের মধ্যভাগে অবস্থিত।—নেপাল রাজ্য দৈর্ঘ্যে ৫০০ মাইল প্রস্থে কোন স্থানেই ১৪০ মাইলের অধিক নয়,—গড়ে ১০০ মাইল মাত্র।

সীমা।—ইহার উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে হিন্দুস্থান, পূর্ব্বে সিকিম, পশ্চিমে কুমায়ুন ও রোহিলা প্রদেশ। পূর্ব্বে নেপাল রাজ্য পশ্চিম সীমায় শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের পর সিগাউলির সন্ধি দ্বারা সার ডেভিড্ অক্টারলনি কুমায়ুন রোহিলাখণ্ড প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিয়া ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তখন হইতে সিমলা, নৈনিতাল, মসুরি প্রভৃতি নেপালরাজ্যের অঙ্গচ্যুত হইয়াছে। এক্ষণে নেপালরাজ্য আয়তনে পঞ্জাবের ন্যায়, এবং জন সংখ্যা ৪০,০০০০০ লক্ষ হইবে। এক কাটমণ্ডুর উপত্যকায় ২৫০০০০ লোকের বাস। নেপালের উত্তরে চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতমালা অবিচ্ছেদে বিস্তৃত। এই সকল পর্ব্বতমালা ১৬,০০০ ফিট হইতে ২৮,০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইবে। পৃথিবীর মধ্যে চারিটী অত্যুচ্চ শিখরই এই নেপাল প্রদেশে অবস্থিত। যথা,—নন্দদেবী, ধবলগিরি, গোঁসাইথান, এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর। পশ্চিমে নন্দদেবী কুমায়ুনের শিরোভূষণ রূপে অবস্থিত। নন্দদেবীর ২০০ মাইল পূর্ব্বে ধবলগিরি, ধবল-

গিরির ১৮০ মাইল পূর্ব্বে গোঁসাইস্থান। গোঁসাইস্থানের ১৩০ মাইল পূর্ব্বে এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর। নেপালরাজ্য, হিন্দুস্থানের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ নদীর জন্মস্থান। উপরিলিখিত চারিটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর এবং তন্নিস্থত নদী সকল নেপাল রাজ্যকে চারিটী বিভিন্ন প্রাকৃতিক অংশে বিভক্ত করিয়াছে, আমরা যথাক্রমে নেপা-লের নদীগুলির নাম উল্লেখ করিতেছি। ১ম পশ্চিমে **কালী বা সরযু** নদী নন্দদেবী হইতে নিঃসৃত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ হইয়া, ক্রমে অযোধ্যা প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঘর্ঘরা (বা কর্ণালি) নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

২। **ঘর্ঘরা** (বা কর্ণালি)—হিমাচলের ক্রোড়ে ঘর্ঘরার অপর নাম কর্ণালি—হিন্দুস্থানে ইহা ঘর্ঘরা নামেই প্রসিদ্ধ। মানস সরোবরের নিকট জন্মগ্রহণ করিয়া টিকলাখড় পাশ দিয়া নেপাল-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। নেপালের অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। ঘর্ঘরা নদী—হিন্দুস্থানে অযোধ্যা প্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া সরযু এবং কুশীর সহিত মিলিত হইয়া দানাপুরের একটু উপরে গঙ্গায় আসিয়া পতিত হইয়াছে।

৩। **রাপ্তিনদী**—ধবলগিরিতে রাপ্তির জন্ম—অযোধ্যার উত্তর পূর্ব্বাংশ দিয়া গোরক্ষপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রাপ্তিনদী অবশেষে ঘর্ঘরার সহিত মিলিত হইয়াছে।—গোরক্ষপুর ইহার দক্ষিণতীরে অবস্থিত।

৪। **গণ্ডকী** নদী নেপালের মধ্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে—

৫। **পূর্ব্বে কুশী নদী**—নেপাল রাজ্য এই তিনটী প্রাকৃতিক অংশে বিভক্ত। পশ্চিমে ঘটরা প্রদেশ—মধ্যে গণ্ডকী প্রদেশ—পূর্ব্বে কুশী প্রদেশ।—এই তিনটী প্রদেশ ছাড়া কাটমণ্ডু উপত্যকা নেপালের একটী বিশেষ অংশ, ইহার পশ্চিমে গণ্ডকী প্রদেশ, পূর্ব্বে কুশী প্রদেশ। কাটমণ্ডুর উপত্যকায় বাঘমতী নদীর জন্ম হইয়াছে। বাঘমতী নদী ক্রমে দক্ষিণাভিমুখিনী হইয়া মুঙ্গেরের সন্নিকটে গঙ্গায় গিয়া পতিত হইয়াছে।—

পূর্ব্ব সীমায় ক্ষুদ্র মিচী নদী নেপাল রাজ্যের পূর্ব্বতম সীমা। এই নদী নেপাল ও সিকিমের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ হইয়াছে।

নেপাল হইতে তিব্বতে যাইবার কতকগুলি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ হিমালয়ের মধ্য দিয়া আছে। আমরা পশ্চিম হইতে যথাক্রমে এই গিরিপথ গুলির উল্লেখ করিব।

১। টিক্‌লাখর পাশ (Tiklakhar or Yaripass) নন্দ-দেবী এবং ধবলগিরির মধ্যে ইহা অবস্থিত। হিমালয়ের উত্তরে মানস সরোবরের নিকট ঘর্ঘরা নদী জন্মগ্রহণ করিয়া এই পথ দিয়া নেপালে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

২। মৎস্য পাশ—ধবলগিরির ৪০ মাইল পূর্ব্বে এই পথটী অবস্থিত।

৩। কিরাং পাশ—

৪। কুটী পাশ—এই দুইটী পথ যথাক্রমে গোঁসাইস্থানের পশ্চিমে এবং পূর্ব্বে অবস্থিত। এই দুইটী পথ দিয়াই তীব্বত হইতে অধিকতর যাত্রী নেপালে যাতায়াত করিয়া থাকে। লাশা

হইতে কাটমণ্ডু আসিতে হইলে কুটী এবং কিরাং পাশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ। কুটী পাশ দিয়া ৪।৫ দিনের মধ্যে পদব্রজে লাশা যাওয়া যায়। এ পথে অশ্বারোহণে যাওয়া সম্ভব নয়। কুটী পাশ কাটমণ্ডু হইতে ৯০ মাইল এবং কিরাং পাশ ১০০ মাইল হইবে। কিরাং পাশ দিয়া অশ্ব সকল অনায়াসে গমনাগমন করে, এই কারণে কিরাং পাশই বাণিজ্যোদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিরাং পাশ দিয়া লাশা যাইতে ৭।৮ দিন লাগিয়া থাকে। একবার হিমাচল পার হইলে তীব্বতের পথ অতি সুগম হইয়া পড়ে, তখন আর যাত্রীগণের কোন কষ্টই হয় না।

৫। হাতীয়া পাশ।—কুটী পাশের ৪০।৫০ মাইল পূর্ব্বে হাতীয়া পাশ। হাতীয়া পাশ দিয়া কুশীর একটী শাখা নেপালে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

৬। ওয়ানাং পাশ নেপালের পূর্ব্বতম গিরিপথ। কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিমে ইহা অবস্থিত।

এই সকল গিরিপথ কেবল তীব্বতের লোকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। কাঠমণ্ডু উপত্যকায় শীতকালে দলে দলে তীব্বতীয়গণ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া আগমন করে। নানাবিধ কম্বল, পার্ব্বত্য অশ্ব, কুকুর, মেষ, ছাগল, নানাবিধ প্রস্তর, চামরীর পুচ্ছ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মৃগনাভি, লবণ প্রভৃতি তীব্বতীয়গণ নেপালে লইয়া আসে। নেপাল হইতে অনেক লোক এবং কাশ্মিরীগণ কিরাং ও কুটী পাশ দিয়া লাশায় গিয়া থাকে।

নেপালের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান

ঘর্ঘরা প্রদেশ—জুমলা, ডোটী, এবং সালিয়ানি প্রদেশে বিভক্ত,—পূর্ব্বে ইহা দ্বাবিংশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল এবং বাইশ রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। বাইশরাজ জুমলার রাজার করদ ছিলেন। বাইশ রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে জুমলা রাজ্য স্থাপিত। বর্ত্তমান সময়ে জুমলা এবং বাইশ রাজ নেপালের গুর্খারাজার সামন্ত রাজা। জুমলার দক্ষিণ পশ্চিমে ডোটি রাজ্য। ডোটি নেপালের পশ্চিমতম প্রান্তে স্থিত—ইহার রাজধানীও ডোটী। এখানে নেপাল রাজের গড় এবং সৈন্য আছে। ডোটী সহরে ৪।৫ শত গৃহ আছে। ডোটী বারেলীর ৮৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত এবং আলমোরার ৭০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে। ডোটী হইতে কাটমণ্ডু যাইবার পথ ১৬২ ক্রোশ হইবে।

সালিয়ানি—ডোটী প্রদেশের পূর্ব্বে সালিয়ানি। এই প্রদেশ দিয়া রাপ্তি নদী প্রবাহিত। সালিয়ানি লক্ষৌর ১২০ ক্রোশ উত্তরে।

পেনটানা।—সালিয়ানির পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে পেনটানা সহর এবং কাটমণ্ডুর ৮৬ ক্রোশ পশ্চিমে। এখানে নেপালরাজের বারুদ বন্দুক প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। এই প্রদেশে বিস্তর সোরা আছে।

সপ্ত গণ্ডকী প্রদেশ—গণ্ডকী প্রদেশ চরিটি বিভিন্ন

অংশে বিভক্ত; (১) মালিরাম, (২) কাচি, (৪) পালপা, (৩) ধবলাগিরি। ধবলাগিরি হইতে গোঁসাইথান পর্ব্বতের দক্ষিণে,—ইহাই সপ্তগণ্ডকী প্রদেশ। গণ্ডকীর সপ্তশাখা এই প্রদেশে প্রবাহিত। ইহা নেপালের মধ্যাংশ। গণ্ডকীর এই সপ্তশাখা যথাক্রমে (১) বরিগর (২) নারায়ণী (৩) সইত গণ্ডকী (৪) মারসংতি (৫) দারামদি (৬) গণ্ডী (৭) ত্রিশূলগঙ্গা।

ত্রিশূলগঙ্গা—গণ্ডকী প্রদেশের পূর্ব্বতম সীমান্তবর্ত্তিনী নদী। গোঁসাইথান পর্ব্বতের শিখরস্থিত দ্বাবিংশতি হ্রদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম হ্রদে ইহার জন্ম।

গোঁসাইথান—নেপালের একটী উন্নত শিখর। গোঁসাইথান নেপালীদের এক প্রধান তীর্থ। গোঁসাইথানের চিরতুষারাবৃত শিখরের নিম্নেই স্তরে স্তরে দ্বাবিংশতিটী তুষার বারিপূর্ণ হ্রদ আছে। এই সকল হ্রদের নিম্নে জিবজিবিয়া পর্ব্বতমালা প্রাকার স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। এই জিবজিবিয়া দক্ষিনমুখী হইয়া অবশেষে কাঠমণ্ডু উপত্যকার উত্তরে ১৫০০০ ফিট উন্নত মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গোঁসাইথানের বৃহত্তম হ্রদই নীলকণ্ঠকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। নেপালে এরূপ কথিত আছে,—সমুদ্র মন্থন কালে কালকুট পান করিয়া বিষের যন্ত্রণায় মহাদেব হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং গোঁসাইথানের হিমজলে অবগাহন করিয়া শীতল হইয়াছিলেন, তাঁহার ত্রিশূলের আঘাতে হিমালয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া ত্রিশূলগঙ্গা প্রবাহিত হইল এবং ত্রিশূলগঙ্গার জল পান করিয়া নীলকণ্ঠের

জ্বালা বিদূরিত হইল। এক্ষণে নীলকণ্ঠকুণ্ডের মধ্যে একটী পর্ব্বত নিমজ্জিত আছে, তীর্থযাত্রীগণ তাহাকে প্রকৃত নীলকণ্ঠ বিবেচনা করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌ হৃদয়ে নিরীক্ষণ করে। কিন্তু সেই হ্রদের তুষার শীতলজল কেহই স্পর্শ করিতে পারে না। কাটমণ্ডু উপত্যকা হইতে শত শত যাত্রী গোঁসাইথানে তীর্থ করিতে যায়। গোঁসাইথানের পথ অতি বিপদজনক। পথে কোন আশ্রয় নাই, কোন প্রকার খাদ্যের সংস্থান নাই, শীতও অতি দুরন্ত। সেই ভীষণ শীতে যাত্রীগণ বাহিরেই রাত্রি যাপন করে। পথের দারুন কষ্টে অনেকের প্রাণ বিয়োগ হয়; তথাপি এই কষ্ট স্বীকার করিয়াও দলে দলে লোক গোঁসাইথানে গমন করে।

নায়াকোট—নায়াকোটের উপত্যকা দিয়া ত্রিশূলগঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছে। এই উপত্যকায় প্রচুর পরিমানে ফল শষ্য জন্মে। কিন্তু এখানে ম্যালেরিয়ার বড়ই প্রদুর্ভাব। গণ্ডকী নদীর পশ্চিম তটে পশ্চিম নায়াকোট। দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান অত্যাচারে অস্থির হইয়া রাজপুতগণ প্রথমে এখানে আশ্রয়লাভ করে। পরে গোরখালি নামক প্রদেশ অধিকার করিয়া স্থায়ীরূপে বাস করে। গোরখালি হইতে এই গোর্খা নামের উৎপত্তি।

পাল্পা—কাটমণ্ডু হইতে ৬৩ ক্রোশ এবং বিটুলের নয় ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। পালপার পাঁচ মাইল দূরে নেপাল রাজের একটী প্রধান সৈন্যাবাস আছে। পালপার শাসন-কর্ত্তা সর্ব্বদাই রাজবংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ হইয়া থাকেন। এই স্থানে মুদ্রাসকল প্রস্তুত হইয়া থাকে। পালপার অন্তর্গত গুলমি নামে

এক স্থান আছে। কাটমণ্ডুর গুর্খা রাজা পালপা এবং গুলমি জয় করিয়াছিলেন। রণবাহাদুর গুলমি অধিকার করিয়া গুলমি রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন—রণবাহাদুর পালপার রাজকুমারীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পোখরা—গোর্খা প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে,—পালপার সন্নিকটে পোখরার উপত্যকা অবস্থিত। পোখরা সহরটী উক্ত প্রদেশের প্রধান সহর। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানকার জনসংখ্যা অধিক; পোখরায় তাম্র পাত্র প্রস্তুত হয়। এখানে একটি বার্ষিক মেলা হয় তাহাতে প্রচুর শস্য ও এই প্রদেশের কৃষিজাত দ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে। পোখরার উপত্যকা কাটমণ্ডুর উপত্যকা অপেক্ষা বিস্তীর্ণ; এখানে অনেকগুলি হ্রদ আছে এবং এই কারণেই স্থানটীর নাম পোখরা হইয়াছে। আমরা যাহাকে পুস্করিণী বা চলিত ভাষায় পুকুর বলি নেপালীরা তাহাকে পোখরী বলিয়া থাকে। এই উপত্যকার বৃহৎ হ্রদটী এত বিস্তৃত যে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে দুই দিবস সময় যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হ্রদের জল এতই নীচে যে কোন প্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কাঠমণ্ডুর উপত্যকার ন্যায় এস্থান নদী বহুল নয়। জলের অভাবে কৃষিকর্ম্মের বিশেষ অন্তরায় ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে কোন চাষবাস হয় না।

কুশী প্রদেশ—নেপালের পূর্ব্বাংশ দিয়া কুশী এবং তাহার উপনদী সকল প্রবাহিত—এই হেতু ইহাকে কুশী প্রদেশ

কহিয়া থাকে—গোঁসাইথান হইতে গৌরীশঙ্কর বা এবারেষ্ট পর্য্যন্ত পর্ব্বত মালার দক্ষিণে কুশী প্রদেশ অবস্থিত। গণ্ডকীর ন্যায় কুশীরও সপ্ত শাখা আছে, এই জন্য ইহাকে সপ্তকুশী বলে। কুশীর সপ্তশাখা যথাক্রমে (১) মিলামচি, (২) ভুটিয়া কুশী, (৩) তামাকুশী, (৪) লিখু, (৫) দুধকুশী, (৬) আরান, (৭) তামোর। কুশী প্রদেশের উত্তর সীমায় কুটী, হংতিয়া এবং ওয়ানাং পাশ অবস্থিত। সিম্‌লালিয়া পর্ব্বতমালা দ্বারা কুশী প্রদেশ সিকিম হইতে বিভক্ত। মিচি নদীই উভয় রাজ্যের সীমা। নেপালের পূর্ব্বতম সীমায় ইলাম নামে একটী ক্ষুদ্র নগর আছে। সিকিম হইতে এবং দারজিলিং হইতে নেপালীগণ সর্ব্বদাই ইলাম হইয়া নেপালে যাতায়াত করিয়া থাকে।

নেপালের পুরাবৃত্ত

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নেপালরাজ্য বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বিস্তীর্ণ প্রদেশ ছিল না। নেপালের বর্ত্তমান কাটমণ্ডু উপত্যকার চতুর্দ্দিকেই কেবল ইহার স্বাধীন রাজ্য বিস্তীর্ণ ছিল। এই স্থানে নেওয়ার নামধেয় মঙ্গোলীয় এবং হিন্দুজাতির সংমিশ্রিত এক শান্ত-স্বভাব, নিরীহ, পরিশ্রমী জাতির আবাস স্থান ছিল। নেওয়ারগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। কথিত আছে নীমুনি নামে জনৈক মহাত্মার নামে এই রাজ্যের নাম নেপাল হইয়াছে। নী+পাল—অর্থাৎ দেবতার আশ্রিত প্রদেশ। পশুপতিনাথ তীর্থের সহিত নেপালরাজ্যের ইতিহাস অতি দৃঢ়রূপে গ্রথিত। অতি প্রাচীন কালে নীমুনি এখানে গোপবংশের একজনকে রাজা করিয়া নেপালরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উক্তবংশ এখানে বহুশতাব্দী রাজ্য করিবার পর আহীরবংশ কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। নিম্নে যথাক্রমে নেপালের রাজবংশসমূহের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। গোপবংশ।

২। আহীরবংশ।

আহীরবংশের তিনজনমাত্র রাজা হইয়াছিলেন; যথা—

(১) বীর সিংহ।

(২) জয়মতি সিংহ।

(৩) ভবানী সিংহ।

৩। কিরাটীবংশ।

কিরাটীবংশ বহুদিন নেপালে রাজত্ব করেন। কথিত আছে কিরাটীবংশের ৪২ জন রাজা ৮০০ বৎসর নেপালে রাজ্য করিয়াছিলেন। কিরাটীবংশের চতুর্দ্দশ নৃপতি স্থানকোর রাজত্বকালে পাটলীপুত্রের রাজা অশোক সপরিবারে নেপালে আগমন করেন। কাটমণ্ডুর সন্নিকটে যে পাটন আছে তাহা ললিতপাটন নামে তাঁহাদ্বারাই নির্ম্মিত হয়। এখানে অদ্যাবধি অশোকের নির্ম্মিত অনেক বৌদ্ধমন্দির চৈত্য ও বিহার আছে। অশোক অনেকদিন নেপালে বাস করেন। এখানে তাঁহার কন্যা চারুমতির সহিত নেপালরাজ দেবপালের বিবাহ হয়। চারুমতি অবশেষে ভিক্ষুনী হন এবং 'চারুবিহার' নামে এক বিহার নির্ম্মাণ করেন। চারুমতিকে নেপালে রাখিয়া অশোক সপরিবারে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কিরাটীবংশের পর যথাক্রমে

(৪) সোমবংশ—

(৫) সূর্য্যবংশ—

নেপালে রাজত্ব করেন।—সোমবংশের পঞ্চ নৃপতি নেপালে রাজত্ব করেন। সূর্য্যবংশের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয় তিনি তর্কযুদ্ধে সমুদয় ভারতবর্ষস্থিত বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়া নেপালে আগমন করেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ কেহই তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। শঙ্করাচার্য্য নেপালে বৌদ্ধদিগের প্রতি অতিশয় নির্য্যাতন করেন, অনেক বৌদ্ধকে হত্যা করেন। তিনি বৌদ্ধদিগকে জীব হিংসা করিতে

বাধ্য করেন। বিহার সকল ধ্বংশ করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী-দিগের বিবাহ দেন। প্রায় ৮৪০০০ বৌদ্ধ গ্রন্থ ধ্বংশ করেন। দেব মন্দিরে বলি আরম্ভ হয়, নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে শৈব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাও কথিত আছে বিক্রমাদিত্য তাঁহার শকাব্দ নেপালে প্রচলিত করিয়া, ভাটগাঁওএ সূর্য্য বিনায়ক নামে যে গণেশ মূর্ত্তি আছে তাহা তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্য নেপালে গমন করিয়াছিলেন এরূপ উক্ত আছে।—

সূর্য্যবংশের পর

৬। ঠাকুরী বংশ—

৭। রাজপুত বংশ—

৮। কর্ণটকী বংশ—

৯। মল্লরাজ বংশ।

ঠাকুরী রাজা গুণ কর্ম্মদেবের রাজত্ব সময়ে একদা তিনি মহালক্ষীর পূজা করিতেছিলেন, এমন সময় স্বপ্নে দেবী তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, বাঘমতী এবং বিষ্ণুমতী নদীর সঙ্গম স্থলে এক সহর নির্ম্মাণ করিতে হইবে, পুরাকালে এই স্থলে নীমুনি তপস্যা করিয়া-ছিলেন। এই নূতন সহরের আকৃতি দেবীর খড়্গের ন্যায় হইল। রাজা ইহার নাম কান্তিপুর রাখিলেন। শুভ লগ্নে রাজা পাটন হইতে কান্তিপুরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করিলেন। সহরে ১৮০০০ গৃহ নির্ম্মিত হইল। লক্ষ্মী প্রতিজ্ঞা করিলেন যতদিন না ঐ সহরে দিন লক্ষ টাকার কারবার হয়, ততদিন সেখানেই অধিষ্ঠান করিবেন। রাজা

দেবীর কৃপায় সুবর্ণ ধারা নির্ম্মাণ করেন। তিনি রক্ষাকালী ও নবদুর্গা প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে বর্ত্তমান কাটমণ্ডু সহরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নেপালে বর্ম্ম উপাধীধারী ক্ষত্রিয় রাজ বংশই মল্লরাজ বংশের পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিল। এই বর্ম্ম রাজগণের শেষ দুইজন নৃপতির অব্যবহিত পূর্ব্বের রাজা, তিনটী পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। তাঁহার তিনটী পুত্র যথাক্রমে নেপালে রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন পুত্র ছিল না। একজনের সত্যনায়িকা দেবী নামে কেবল এক কন্যা ছিল। এই কন্যাটী নেপালের রাজ্ঞী হন। বারানসীর রাজা হরিশ্চন্দ্র দেবের সহিত নেপালের এই রাণীর বিবাহ হয়। ইঁহাদের রাজলক্ষ্মী নামে এক মাত্র কন্যা জন্মে। সত্যনায়িকা দেবীর মৃত্যুর পর রাজলক্ষ্মী নেপালের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু কতিপয় দিবসের মধ্যে জয়দেব নামে একজন জ্ঞাতি কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে মিথিলার অধিপতি হরিসিংহ দেব মুসলমানগণ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নেপালে আশ্রয় লাভ করেন। এই হরিসিংহ দেব নেপালে জয়দেবকে পরাজিত করিয়া নেপালের সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহাদের উপাধি মল্ল ছিল। পৃথ্বীনারায়ণের নেপাল আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত এই রাজবংশই কাটমণ্ডুর উপত্যকায় রাজত্ব করিতে ছিলেন।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে এই বংশেরই রাজা প্রতাপমল্ল কাটমুণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতি পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইনি মহামারী নিবারণের জন্য রাজ বাড়ীর সম্মুখে

হনুমানের এক বিগ্রহ স্থাপন করেন। পশুপতিনাথের মন্দির সংস্কার করেন এবং পশুপতির মস্তকে স্বর্ণ ছত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। প্রতাপমল্লের কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী শোকে অতিশয় কাতর হন। রাজা রাণীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এক দীঘি খনন করিয়া তন্মধ্যে গৃহ দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। নানা তীর্থ হইতে পবিত্র বারি আনিয়া এই পুষ্করিণীটী পূর্ণ করেন। এই পুষ্করিণী অদ্যাপি রাণীপোখরি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার তীরে হস্তি পৃষ্ঠে রাজা ও রাণীর মূর্ত্তি এখন পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান আছে। ইতিপূর্ব্বে হরি সিংহের অধঃতম ৭ম পুরুষ অক্ষমল্লের ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। অক্ষমল্ল তিন পুত্র ও এক কন্যাকে আপনার সমুদয় রাজ্য বণ্টন করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভাঁতগাঁও, ২য় কে বেনীপার উপত্যকা, ৩য় কে কাটমণ্ডু, কন্যাকে পাটন। প্রতাপ-মল্ল এই তৃতীয় পুত্রেরই বংশধর ছিলেন। ইহার ২০০ বৎসর পরে গুর্খা রাজা পৃথ্বীনারায়ন যখন নেপাল রাজ্য আক্রমণ করেন তখন তিনি এই তিন রাজ্য পৃথক দেখিতে পান, এবং পৃথকভাবে ইহাদিগকে পরাভূত করেন।

গুর্খা বিজয়

গুর্খারাজগণ উদয়পুরের রাজপুত বংশোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন। মুসলমানদিগের অত্যাচারে উদয়পুর ত্যাগ করিয়া ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পালপার নিকট গোরখালী নামক স্থানে বাস করিতেন বলিয়া,ইহারা আপনাদিগকে গোরখালি বা গুর্খা নামে অভিহিত করিতেন। গুর্খাগণ ক্রমে সপ্তগণ্ডকী দেশে রাজ্য বিস্তার করিল। গুর্খাগণ সর্ব্বদাই প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে উৎপাত করিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পৃথ্বীনারায়ণ নামে এক রাজা গুর্খার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অতি ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইঁহার দেশজয় পিপাসা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল জয় করিয়া নেপালের সহিত গুর্খারাজ্য মিলিত করেন। অনেকদিন হইতে ইংরাজের সহিত নেওয়ারদিগের ব্যবসাগত সম্বন্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই হেতু পৃথ্বীনারায়ণ যখন নেপাল আক্রমণ করিলেন তখন কাটমুণ্ডের মল্লরাজ ইংরাজদিগের সহায়তা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময় পাটনে একটী রোমান কাথলিকদের মিশন ছিল এবং সেখানকার অধ্যক্ষ ফাদার গায়সপি (Father Guesseope) গুর্খাবিজয় ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত হইতে সেই সময়কার অনেক ঘটনা জ্ঞাত হওয়া যায়। পৃথ্বীনারায়ণ যে সময় নেপাল আক্রমণ করেন
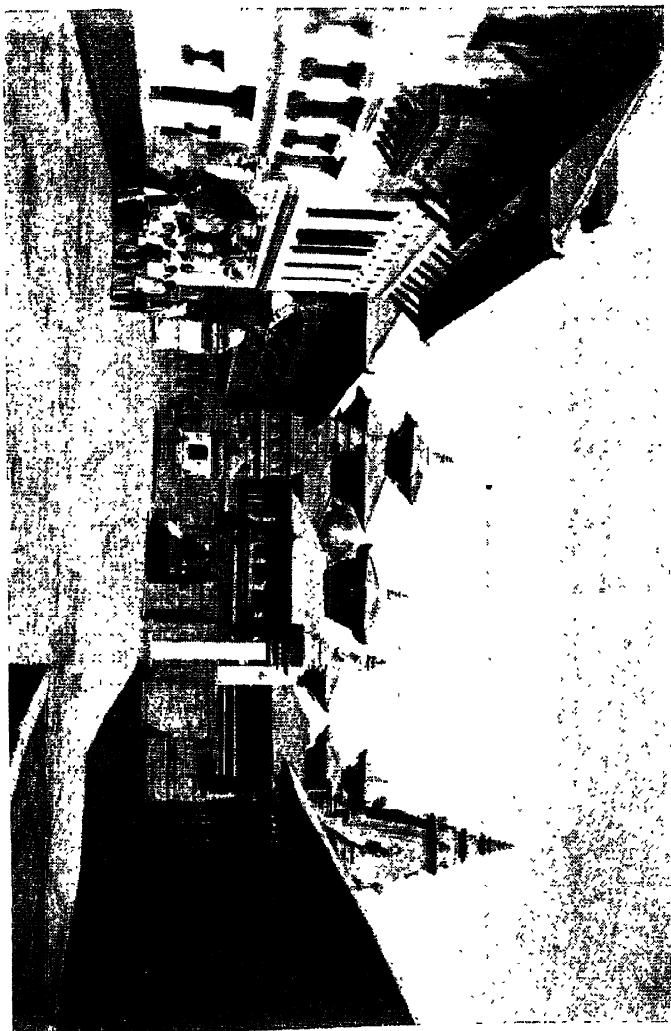
তখন ভাটগাঁও, কাটমুণ্ড, পাটন প্রভৃতির রাজগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই গৃহযুদ্ধ ব্যাপারে ভাটগাঁওয়ের রাজা পৃথ্বীনারায়ণের সহায়তা ভিক্ষা করেন। পৃথ্বীনারায়ণ অবিলম্বে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। তখন ভাটগাঁওএর রাজা আপনার ভ্রান্তি জানিতে পারিয়া সকল গৃহবিবাদ বিস্মৃত হইয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। পৃথ্বীনারায়ণকে একে একে এই সকল রাজ্য পরাভূত করিতে হইয়াছিল। প্রথমে তিনি কীর্ত্তিপুর আক্রমণ করেন। তিন বার চেষ্টার পর সাতমাস অবরোধ সহ্য করিয়া বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণদিগের সহায়তায় পৃথ্বী-নারায়ণ কীর্ত্তিপুর অধিকার করিতে সক্ষম হন। তিনি কীর্ত্তিপুরের আবাল বৃদ্ধের নাসা ও ওষ্ঠ ছেদন করিয়া স্বীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করেন। কীর্ত্তিপুর নামের পরিবর্ত্তে ঐ সহরের নাম নাসাকাটা-পুর রাখেন। ত্বরায় পাটনও হস্তগত করিলেন। ভাটগাঁওয়ের রাজা আত্মসমর্পণ করিয়া এই প্রকার নৃশংস আচরণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের ইন্দ্রযাত্রার দিন অতি আশ্চর্য্য উপায়ে পৃথ্বীনারায়ণ কাটমণ্ডু হস্তগত করিলেন। সেই দিন কটমণ্ডুবাসীগণ উৎসবে উন্মত্ত, পৃথ্বীনারায়ণ কতিপয় সৈন্য সমবিভ্যাহারে কখন যে লুকাইয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন কেহই দেখিতে পায় নাই। ইন্দ্রযাত্রার সময় রথে উঠিয়া কুমারী-গণ সহর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, রথের সম্মুখে রাজার গদি বিস্তৃত হইলে রাজা বা তাহার অনুপস্থিতে তাঁহার তরবারি তদুপরি রক্ষিত হয়। সোদন রথ

চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া যেই রাজবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, অমনি রাজার গদি তাহার সম্মুখে বিস্তৃত হইতেই স্বয়ং পৃথ্বীনারায়ণ সেই গদিতে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমিই এখন অধীশ্বর, আমিই রাজা, রাজা বলিয়া আমায় বরণ কর।" তখন এমন অবস্থা হইল, সমুদয় আনন্দ কোলাহল বিস্ময়ে পরিণত হইল। কাহারও আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বাধা দেয় এমন সাধ্য আর কাহারও রহিল না। বিনা রক্তপাতে কাটমণ্ডু পৃথ্বীনারায়ণের হস্তগত হইল।

পৃথ্বীনারায়ণ পাটন অধিকার করিলে পর তথাকার রোমন কাথলিকগণ পৃথ্বীনারায়ণের এক পুত্রের সহায়তায় নির্ব্বিবাদে পাটন পরিত্যাগ করিয়া সদলে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বিটওয়ার নিকট পুরী নামক স্থানে অদ্যাবধি বাস করিতেছেন। সেখানে নেওয়ার খৃষ্টানগণ অদ্যাপি বংশ পরম্পরায় বাস করিতেছে। পৃথ্বীনারায়ণ দৃঢ় চেষ্টায় এবং চক্রান্ত-কারী ব্রাহ্মণদিগের সহায়তায় এই সকল রাজ্য অধিকার করিলেন। নেওয়ারগণ, বিশেষতঃ কীর্ত্তিপুরের অধিবাসীগণ যে জাতীয় স্বাধীনতা লোপের সময় বীরের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেনা। এবং পৃথ্বিনারায়ণ চক্রান্তকারী ও বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণদিগের সহায়তা না পাইলে কখনই সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

নেপালের বর্ত্তমান গুর্খা রাজগণ

নেপালের গুর্খা রাজা ও রাজমন্ত্রী গণের তালিকা

১। পৃথ্বীনারায়ণ।

২। সিংহ প্রতাপ।

৩। রণ বাহাদুর সাহ।

৪। গৃবাণ যুদ্ধ বিক্রম।

৫। রাজেন্দ্র বিক্রম সাহ।

৬। সুরেন্দ্র বিক্রম সাহ।

৭। পৃথ্বিবীর বিক্রম সাহ।

৮। ত্রিভুবন বিক্রম সাহ।

রাজমন্ত্রী গণ।

১। বাহাদুর সাহ রণবাহাদুর সাহের পিতৃব্য এবং মন্ত্রী

২। দামোদর পাঁড়ে—রণ বাহাদুরের মন্ত্রী।

৩। ভীম সাহ চৌতুরিয়া—রণ বাহাদুরের মন্ত্রী।

৪। ভীমসেন থাপা।

৫। রণ জং পাঁড়ে।

৬। রঘুনাথ পণ্ডিত।

৭। কত্তে জং চৌতুরিয়া।

৮। মাতব্বর থাপা।

৯। গগন সিং।

১০। জঙ্গ বাহাদুর।

১১। রণদীপ সিং।

১২। বীর শামসের।

১৩। দেব শামসের।

১৪। চন্দ্র শামসের।

১। **পৃথ্বী নারায়ণ**—নেপাল জয় করিয়া গুর্খা এবং নেপাল রাজ্য মিলিত করিয়া সমুদায় প্রদেশ নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। পরে কিরাটী এবং লিম্বুদিগকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্বে মিচি নদী পর্য্যন্ত নেপালরাজ্যের সীমা বিস্তার করেন। ক্ষুদ্র নেপাল রাজ্য এই প্রকারে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল। পৃথ্বীনারায়ণ নবজীতরাজ্যে অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

২। **সিংহ প্রতাপ**—পৃথ্বীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহ প্রতাপ পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহ প্রতাপ দক্ষিণে পৈতৃক রাজ্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রণ বাহাদুর সাহ নামে শিশু-পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

৩। **রণবাহাদুর সাহ**—সিংহ প্রতাপের পত্নী রাণী রাজেন্দ্রলক্ষী পুত্রের অপ্রাপ্ত বয়সকালে অতিশয় যোগ্যতার সহিত রাজ্য শাসন করেন। এবং তাঁহার শাসন কালে রাজ্যের পরিসরও বৃদ্ধি পায়। রণ বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই রাণী রাজেন্দ্রলক্ষী পরলোক গমন করেন। তখন রণবাহাদুরের পিতৃব্য বাহাদুর সাহ বালক রাজার

অভিভাবকরূপে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু রণবাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃব্য বাহাদুর সাহকে কারারুদ্ধ করিয়া হত্যা করেন। রণবাহাদুর অতি অযোগ্য নিষ্ঠুর এবং রূঢ় প্রকৃতির নৃপতি ছিলেন। এই সময় হইতেই নেপালের সিংহাসনে ক্রমাগত শিশু রাজা উপবেশন করিয়া আসিতেছেন। অদ্যাবধি এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। রণবাহাদুরের অনেক কুকীর্ত্তি আছে। তাঁহার দুইটী পুত্র ছিল, একটী পরিণীতা রাণীর গর্ভজাত, অপরটি ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত জারজ পুত্র।

প্রথমোক্তের নাম রণোদ্যতসাহ, দ্বিতীয়ের নাম গৃবান যুদ্ধ বিক্রম। এই ব্রাহ্মণী রাজ্ঞী বসন্ত রোগে লুপ্তশ্রী হইয়া আত্মহত্যা করেন। ব্রাহ্মণীর মৃত্যুতে রাজা শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করেন, তন্মধ্যে দেবী মন্দিরের লাঞ্ছনা প্রধান কার্য্য। তিনি সমুদায় শীতলার মন্দির অপবিত্র করিয়া, তথায় পূজা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগের উপরও বিবিধ অত্যাচার করেন। রণবাহাদুর প্রজাদিগের উপর বিবিধ অমানুষিক অত্যাচার করিতেন। ক্রমে তাঁহার মস্তিষ্ক একান্ত বিকৃত হইয়া পড়িল; তখন রাজমন্ত্রী দামোদর পাঁড়ে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কাশী প্রেরণ করেন। রণবাহাদুর ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পুত্র রণোদ্যত সাহকে অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র গৃবাণ যুদ্ধ বিক্রমকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। রণবাহাদুর কাশী গমন করিলে মন্ত্রিগণ পঞ্চমবর্ষীয় বালক (৪) গৃবাণ যুদ্ধ বিক্রমকে রাজপদে অভিষিক্ত

করেন। এবং রণোদ্যতের জননীকে এই শিশু রাজার অভিভাবক মনোনীত করেন। জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী ত্রিপুরাসুন্দরী রণবাহাদুরের সঙ্গে কাশী গমন করিয়াছিলেন। গৃবাণ যুদ্ধ বিক্রম রাজা হইলে ছয় বৎসর বয়স্ক বালক রণোদ্যত শাহ তাহার চৌতুরিয়া অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন। রণোদ্যতের জননী এই উভয় বালকের অভিভাবক ছিলেন। কাশীতে রণবাহাদুর জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী ত্রিপুরাসুন্দরীর উপর অশেষ অত্যাচার করিতেন। অবশেষে ত্রিপুরাসুন্দরী কাশি ত্যাগ করিয়া নেপালে আসিতে মনস্থ করিলেন। ১৮০২ সালে তিনি নেপালের সীমায় পদার্পণ করিলে কনিষ্ঠা মহারাণী একদল সৈন্য তাহার গতিরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাহারা মহিষীর অনুচরবর্গকে বন্দী করিল। রাণী অগত্যা ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর আবার তিনি নেপালের পথে যাত্রা করিলেন। এবারেও তাহার বিরূদ্ধে সৈন্য সামন্ত প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু সৈন্যগণ অন্তরে ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে লইয়া সসৈন্যে তাঁহারা সহরে প্রবেশ করিল। কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ভীত হইয়া শিশু রাজাকে লইয়া পশুপতিনাথের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী বালক রাজাকে আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়া আপনাকে অভিভাবক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কনিষ্ঠা মহিষীও প্রকাশ্যভাবে সমুদায় ক্ষমতা জ্যেষ্ঠার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ঠিক এই সময়েই কাপটেন নক্স (Captain Knox)

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নেপালের রেসিডেণ্ট রূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি নেপাল রাজের সহিত "বাণিজ্য এবং মৈত্রীর" একটী তর্কের মীমাংসার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। নেপাল দরবার মুখে তাহার প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য এবং ভদ্রতা প্রকাশ করিতেন বটে, কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে বড় অগ্রসর হইতেন না। ক্রমে Captain Knox এর ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে লাগিল। এই সময়ে জ্যেষ্ঠা মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী নেপালে প্রবেশ করিয়াছেন এই সংবাদ শুনিবামাত্র কনিষ্ঠা মহারাণী কাপটেন নক্সের (Captain Knox) সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু ত্রিপুরাসুন্দরী অন্তরে ইংরাজদিগকে অতিশয় সন্দেহের চক্ষে দর্শন করিতেন। ইংরাজের সহিত সংশ্রবে আসিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কাপটেন নক্স শীঘ্রই নেপাল দরবারের এই প্রকার বৈরীভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া আসিলেন এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কাশিতে মহারাজ রণবাহাদুরকে নেপালে আসিবার অনুমতি দিলেন। এত দিন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার জোর করিয়া রণবাহাদুরকে কাশীতে রাখিয়াছিলেন। রণ-বাহাদুর অচিরে নেপালে উপস্থিত হইলেন। তখনও দামোদর পাঁড়ে মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি একদিন সৈন্য লইয়া রাজার সম্মুখীন হইলেন। দামোদর অন্তরে রণবাহাদুরের একান্ত বিরোধী ছিলেন। রণবাহাদুরের সহিত ভীমসেন থাপা নামে এক যুবক ছিলেন। রাজার উপর এ ব্যক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। মহারাজ সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলে তিনি তাঁহাকে

বলিলেন "মহারাজ! এমন সুযোগ ছাড়িবেন না, আপনি এই সৈন্যগণকে আপনার বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারিলে চিরদিনের মত দামোদর পাঁড়ের ক্ষমতা চূর্ণ হইবে।" রণবাহাদুর ভীমসেনের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া নিজে সৈন্যদিগের সম্মুখীন হইয়া স্বীয় উষ্ণীষ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিলেন "আমার বিশ্বাসী গুর্খা সৈন্যগণ! তোমরা তোমাদের মহারাজকে চাও, না দামোদর পাঁড়ের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিতে চাও, তোমাদের রাজা কে?" অমনি সৈন্যদল "জয় মহারাজাধিরাজ রণবাহাদুরের জয়" বলিয়া ঘোর জয়নাদে প্রাঙ্গন কম্পিত করিল। পতিপ্রাণা মহিষী ত্রিপুরাসুন্দরী মহারাজকে পরম আদরে গ্রহণ করিলেন। রণবাহাদুর আবার নেপালে তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং অত্যাচার নিষ্ঠুরতায় আবার নেপাল-বাসীকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। রণবাহাদুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াই দামোদর পাঁড়ে ও তাঁহার পুত্রকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং শীঘ্রই ভীমসেন থাপার প্ররোচনায় দামোদর ও তাঁহার পুত্র এবং আরও অনেক পাঁড়েকে হত্যা করিলেন। রণবাহাদুর ভীমসেন থাপাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। একটী বড় আশ্চর্য্য কথা যে, গৃবান যুদ্ধ বিক্রমকে রাজা বলিয়া অস্বীকার করিতে প্রজাগণ কেহই প্রস্তুত হইল না। তখন অগত্যা রণ-বাহাদুর স্বীয় পুত্রের অভিভাবক হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই রণবাহাদুরের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া

উঠিল। তখন রাজ্যের কতিপয় প্রধান পুরুষ রণবাহাদুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শের বাহাদুরের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এক চক্রান্তে লিপ্ত হইল। রণবাহাদুর এ চক্রান্তের বিষয় অবগত হইয়া ভীমসেন থাপার পরামর্শে তৎক্ষণাৎ শের বাহাদুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নেপালের পশ্চিমাংশে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের সহিত মিলিত হইতে আদেশ করিলেন। শের বাহাদুর অতি অবজ্ঞাসূচক ভাষায় এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করিলে রণবাহাদুর অমনি তাঁহার মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। এই কথা শুনিয়া শের বাহাদুর হস্তস্থিত তরবারির দ্বারা রণবাহাদুরকে আক্রমণ করিলেন। এ দিকে বালনুর সিংহ কনওয়ার নামে এক প্রধান থাপা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই দুই ভ্রাতাই নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। এই বালনুর সিংহ কনওয়ারই সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গ বাহাদুরের পিতা। বালনুর সিংহের এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে বিশেষ সম্মানিত করা হয়। রণবাহাদুরের মৃত্যুতে ভীমসেন থাপার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইল। প্রধান মন্ত্রী রূপে তিনি এবং মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী অতি যোগ্যতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। রণবাহাদুরের মৃত্যুর সময় গৃবাণ যুদ্ধ বিক্রম দশ বৎসরের বালক মাত্র ছিলেন। রণবাহাদুরের সহিত কনিষ্ঠা মহারাণী সহমৃতা হইয়াছিলেন। ভীমসেনের বিশেষ ইচ্ছায় এইরূপ হইয়াছিল। রণবাহাদুরের মৃত্যুর পরও শের সাহের চক্রান্তে লিপ্ত এই অনুযোগ দিয়া ভীমসেন স্বীয় বিরোধীদিগকে হত্যা করেন। ইতিপূর্ব্বে

পাঁড়েগণকেও হত্যা করা হইয়াছিল। এই রূপে প্রধান রাজ পুরুষ-দিগের দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল।

মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী ইংরাজদিগের বন্ধু ছিলেন না। ইংরাজ-দিগের সহিত নেপালরাজ কোন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন না; অধিকন্তু গুর্খাগণ সর্ব্বদাই ইংরাজরাজ্যে অল্পাধিক অত্যাচার করিত। পিণ্ডারী দস্যুদলকে দমন করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বারম্বার নেপালরাজকে অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দুর্ভেদ্য নেপাল রাজ্যে অনেক দস্যু আশ্রয়লাভ করিয়া-ছিল। এই সকল নানা কারণে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপালের সহিত ইংরাজরাজ রণঘোষণা করিলেন। রণবাহাদুরের মৃত্যুর পর অমর সিং থাপা কুমায়ুন গাড়ওয়াল প্রভৃতি অধিকার করিয়া শতদ্রু পর্য্যন্ত নেপালরাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। এই যুদ্ধের পর নেপালরাজ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সিগাউলির সন্ধিতে নেপালের পশ্চিমাংশ ইংরাজের হস্তগত হইল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে অনারেবল ই, গার্ডিনার (H. E. Gardiner) নেপালের রেসিডেণ্ট্ হইয়া আসিলেন। ইনিই প্রথম নেপালের রেসিডেণ্ট্। গার্ডিনার সাহেব আসিবার দুই মাস পরেই মহারাজ গৃবাণ যুদ্ধ বিক্রম সাহ ২১ বৎসর বয়সে বসন্তরোগে গতাসু হন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দুই বৎসর বয়স্ক পুত্র (৫) **রাজেন্দ্রবিক্রম সাহ** নেপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ব্বের মহারাজদ্বয়ও শৈশবেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

এই শিশুকে পাইয়া ভীমসেন থাপার শক্তি অপ্রতিহত হইল। এই ভীমসেন থাপা রাজ্যশাসনবিষয়ে অতি যোগ্যপুরুষ ছিলেন। ইনি যদিও অন্তরে ইংরাজদিগের বন্ধু ছিলেন না, কিন্তু ইংরাজের সহিত বিবাদে যে নেপালের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। এই হেতু কোন প্রকার অশান্তির কারণ উপস্থিত হইতে দিতেন না। ইংরাজের সহিত সদ্ভাব এবং শান্তি, নেপালের স্বাধীনতা রক্ষার এক মাত্র উপায় বলিয়া জানিয়াছিলেন। ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আসিতে কিছুতেই সম্মত ছিলেন না; এবং যাহাতে ইংরাজ প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ ভাবে কোন প্রকারে নেপালের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন, সে বিষয়ে দূরদর্শিতার সহিত ইংরাজের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কি জঙ্গ বাহাদুর কি বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ এ পর্য্যন্ত সকলেই ভীমসেন থাপার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। নেপালের রাজমন্ত্রীদিগের বিষয় আর একটী বিশেষ কথা বলিতেছি;—ইংরাজগণ প্রথম হইতেই নানা উপায়ে রাজমন্ত্রীদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা যতই ক্ষমতাপ্রিয়, স্বার্থপর হউন না কেন, জাতীয় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিতে কিছুতেই প্রস্তুত হন নাই। পরস্পরের শত্রুতা বিস্তর করিয়াছেন, স্বজনের রক্তে নেপাল বারম্বার কলুষিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের বৈরিতা কেহই করেন নাই।

ভীমসেন থাপার সময়ে নেপালের অনেক আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ১৮১৬ সালের সন্ধির পর যদিও নেপাল-

রাজ্যের একতৃতীয়াংশ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল, তথাপি ভীমসেনের সুযোগ্য শাসনে এবং চেষ্টায় নেপালের বিবিধ উন্নতি সাধিত হয়। (১) সৈন্যসংখ্যাবৃদ্ধি, (২) ধনবৃদ্ধি। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের বিস্তর ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল এবং অসংখ্য দেবমন্দিরের বিস্তর ভূসম্পত্তিও ছিল। ১৮১৪ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি সমুদায় পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে সমবেত করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভূমি দান করিতে অনুরোধ করেন। অনেকে স্বেচ্ছায় স্বীয় সম্পত্তি দান করেন। কিন্তু ভীমসেন অধিকাংশ ব্যক্তিকে স্বীয় স্বীয় অংশ দিতে বাধ্য করেন। দেবমন্দিরের ভূসম্পত্তিও সৈন্যরক্ষার জন্য গ্রহণ করা হইল। এই প্রকারে রাজকোষে বিস্তর অর্থাগম হইল। এবং রাজ্যে শান্তি থাকাতে ব্যবসার উন্নতির জন্য ধনাগম হইতে লাগিল। ভীমসেন থাপার হস্তে নেপালের সৈনিকবল এবং অর্থবল বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি সৈন্যগণকে সর্ব্বদাই কৃত্রিম যুদ্ধ এবং গোলা বারুদ বন্দুক প্রভৃতির নির্ম্মাণে নিযুক্ত রাখিতেন। সৈন্যগণের হৃদয়ে ভীমসেনের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ভীমসেন থাপার প্রতাপ ততদিন অপ্রতিহত ছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর ভীমসেনের ভাগ্যাকাশ অন্ধকারময় হইয়া আসিল। মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী অতি যোগ্যতার সহিত নেপালের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভীমসেনের ভ্রাতা রণবীর সিংহ থাপা ভীমসেনের প্রতি অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করিতেন। তিনি সেই সময় প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

বালক রাজা রাজেন্দ্র বিক্রমের উপর রণবীর সিংহের প্রভাব দিন দিন অধিক হইতেছিল। তিনি মহারাজকে সর্ব্বদাই ভীমসিংহের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে মাতব্বর সিংহ নামে ভীমসেন থাপার এক ভ্রাতুষ্পুত্র দিন দিন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। রণবীর সিংহ, ভীমসেন থাপা ও মাতব্বর সিংহের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন; কিন্তু স্বহস্তে কিছু করিতে পারেন নাই। যাহা হউক রণবীর সিংহ প্রমুখ দল দিন দিন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রাজেন্দ্র বিক্রম সাহ ভীমসেনের দলের অনেক ব্যক্তিকে কর্ম্মচ্যুত করেন। এবং দামোদর পাঁড়ের পুত্রকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের সমুদায় ভূসম্পত্তি পুনঃপ্রদান করেন। এই সময় হঠাৎ মহারাজ রাজেন্দ্র বিক্রমের সর্ব্বকনিষ্ঠ একবৎসরবয়স্ক পুত্রটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অমনি মহারাজ বলিলেন যে, বালকটীর ভীমসেন থাপা কর্তৃক প্রদত্ত বিষভক্ষণে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এরূপ কথিত আছে মহারাজ স্বয়ং সেই পুত্রকে হত্যা করিয়া ভীমসেনকে দণ্ড দিবেন এই হেতু এরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ভীমসেন থাপার নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সমুদায় থাপা পরিবার, রণবীরসিংহ, মাতব্বর সিংহ, রাজবৈদ্য এবং আরও অনেক ব্যক্তির প্রতি অমানুষিক অত্যাচার সংঘটিত হয়। রাজবৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহাকে হত্যা না করিয়া তাহার ললাট এরূপ দগ্ধ করা হয় যে মস্তকের ঘৃত বাহির হইয়া পড়ে। এই সমুদায় ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করা হইল। একটি নেপালী

বৈদ্যের শরীরের চর্ম্ম উন্মোচন করিয়া জীবিতাবস্থায় তাহার হৃদ্ যন্ত্র বাহির করিয়া ফেলা হইল কিন্তু এত অত্যাচারেও কেহ ভীমসেন থাপার বিরুদ্ধে এক অক্ষরও উচ্চারণ করিল না।

রাজা স্বচক্ষে এই সকল অমানুষিক অত্যাচার দর্শন করিতেন। মহারাজ রাজেন্দ্র বিক্রম সাহের দুইটী মহিষী ছিল। জ্যেষ্ঠার —গর্ভে তিন পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্টটির হত্যা হওয়াতে এই সকল পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হয়। কনিষ্ঠা মহিষীব দুইটী পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠা মহারাণী পাঁড়েদিগের পক্ষপাতিনী, কনিষ্ঠা থাপাদিগের। ভীমসেনের প্রতি এই সকল অত্যাচার লইয়া কনিষ্ঠা মহারাণী মহারাজকে অনেক অনুযোগ করিয়াছিলেন এবং তাহার চেষ্টায় কিছুদিনের জন্য ভীমসেন থাপাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। দুই বৎসর পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে দামোদর পাঁড়ের পুত্র রণজিৎ পাঁড়ে তদানীন্তন রাজমন্ত্রী হইয়া ভীমসেনের প্রতি এই হত্যার অভিযোগ আনয়ন করেন। পুনরায় অনেক প্রাকার অত্যাচারের সূত্রপাত হইল। যন্ত্রণা সহ্য করিতে অপারক হইয়া ভীমসেন আত্মহত্যা করিতে প্রয়াস পান এবং স্বীয় খুকরির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। যে ভীমসেন থাপা নেপালরাজ্যের অশেষ প্রকার কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, যিনি এক সময়ে নেপালের দোর্দ্দণ্ড ও প্রতাপান্বিত রাজমন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার মৃতদেহের অবমাননা করিতে শত্রুগণ কুণ্ঠিত হইল না। ভীমসেনের মৃতদেহ রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইয়া শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইল। জ্যেষ্ঠা মহারাণী

এবং রণজিৎ পাঁড়ে অতিশয় নিষ্ঠুর এবং ন্যায়বিরুদ্ধ আচরণ সকল করিয়া প্রজাদিগকে রাজাধিরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন। সৈন্যদিগের ভাতা কমাইয়া দিয়া বিদ্রোহের সূচনা করেন। রামনগর বলপূর্ব্বক দখল করাতে ইংরাজের সহিত যুদ্ধের সূচনা হওয়াতে অগত্যা রামনগর ছাড়িয়া দিতে নেপালরাজ বাধ্য হন। সেই সময়ে ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি হয় তদ্দ্বারা পাঁড়েদিগকে মন্ত্রিপদ হইতে অপসারিত করিতে মহারাজ বাধ্য হন। তখন রঘুনাথ পণ্ডিত এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজভক্ত কৃষ্ণরাম, ফতেজং চৌতুরিয়া তাঁহার ভ্রাতা গুরুপ্রসাদ, দলভঞ্জন পাঁড়ে এবং অভিরাম রাণাকে লইয়া এক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই সময় রাজ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজেন্দ্র বিক্রমের জ্যেষ্ঠা মহিষী পাঁড়েদিগের সহিত গোপনে সর্ব্বদাই চক্রান্ত করিতেন। রাজাধিরাজ সকল কার্য্যের অযোগ্য হইয়াও প্রত্যেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। রাজকুমার তখন দ্বাদশবর্ষীয় বালকমাত্র; কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর এবং দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতিবশতঃ নিয়ত সকলের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া স্বীয় পৈশাচিক প্রকৃতি চরিতার্থ করিত।

ইতি মধ্যে ১৮৪০ সালে জ্যেষ্ঠা মহারাণীর মৃত্যু হইল। দেশের আপামর সাধারণ লোক এই শাসনবিপর্য্যয়ে অস্থির হইয়া কনিষ্ঠা মহারাণীকে রিজেণ্ট করিয়া রাজকুমারকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু চৌতুরিয়াগণ এ প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। যাহা হউক সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রকাশ্য দরবারে রাজা

রাজেন্দ্র বিক্রম তাঁহার কনিষ্ঠা মহিষী মহারাণী লক্ষ্মী দেবীকে রাজরক্ষয়িত্রী করিয়া সুরেন্দ্র বিক্রমকে রাজাধিরাজ করেন; কিন্তু নিজেও রাজপদে অভিষিক্ত থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ্মী দেবী সকল ক্ষমতা আয়ত্তাধীন করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজাধিরাজ করিতে সচেষ্ট হন; কিন্তু চৌতুরিয়া এবং পাঁড়েগণ ইহার বিরোধী ছিলেন। লক্ষ্মী দেবী থাপাদিগের পক্ষপাতিনী ছিলেন। থাপাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান্ পুরুষ মাতব্বর থাপা তখন বিদেশে ছিলেন। মহারাণী তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিবার প্রলোভন দেখাইয়া নেপালে আনয়ন করেন। এই সময় তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র কাজি জঙ্গবাহাদুরও নেপালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জঙ্গ বাহাদুর পরে নেপালের ভাগ্যচক্র কিরূপ আত্মবশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। মাতব্বর থাপা দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই স্বীয় পিতৃব্য ভীমসেন থাপার হত্যাকারীদের উপর বৈরনির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করেন। করবার পাঁড়ে, কুলরাজ পাঁড়ে, ইন্দ্রবীর থাপা, কনক সিংহ প্রভৃতিকে হত্যা করা হয়, এবং সমুদায় পাঁড়ে নেপাল হইতে বিতাড়িত হন। মাথব্বর থাপা প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইয়া রাজা রাজেন্দ্র বিক্রম, রাজকুমার সুরেন্দ্র বিক্রম এবং মহারাণী লক্ষ্মী দেবী এই তিন ব্যক্তির তিনটী দোষ দেখেন। রাজা অতি অযোগ্য, অপদার্থ; কিন্তু চক্রান্তকারী অবিশ্বাসী, রাজকুমার প্রচণ্ড ক্রোধনস্বভাব,ও অমানুষিক নিষ্ঠুর। মহারাণী ক্রুরচক্রী এবং স্বীয় পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য নিয়ত সচেষ্ট

মাতব্বর প্রথমে মহারাণীকে রিজেণ্ট করিয়া রাজকুমারকে রাজাধিরাজ পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাণীর অভিপ্রায় অন্যরূপ জানিয়া রাজকুমারের পক্ষ অবলম্বন করেন। মহারাণী মাতব্বর থাপাকে স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির অন্তরায় দেখিয়া তাঁহার উচ্ছেদসাধনে তৎপর হন। রাজকুমারের পক্ষাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মহারাজাধিরাজ রাজেন্দ্র বিক্রম তাঁহার প্রতি বিমুখ হন। অবশেষে মহারাজ ও মহারাণী চক্রান্ত করিয়া একদিন রাত্রে হঠাৎ মাতব্বরকে ডাকিয়া আনিয়া নিজেদের সমক্ষেই তাঁহাকে হত্যা করিলেন। কথিত আছে রাজাজ্ঞায়, জঙ্গ বাহাদুরই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। এইরূপে মাতব্বর থাপাকে অল্পদিনের জন্য ডাকিয়া আনিয়া হত্যা করা হইল। মাতব্বর থাপার মৃত্যুর পর গগন সিংহকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া আবার এক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। (জঙ্গ বাহাদুর, অভিরাম রাণা, দলভঞ্জণ পাঁড়ে প্রভৃতিকে লইয়া) গগন সিংহ হীন কুলোদ্ভব হইয়াও মহারাণীর প্রসাদে এই উচ্চপদ লাভ করিল। স্বয়ং মহারাজই, মহারাণীর সহিত গগনসিংহের এই প্রকার ঘনিষ্ঠতায় অতিশয় বিরক্ত হইতেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় গোপনে গগন সিংহকেও হত্যা করা হইল। গগন সিংহ স্বীয় গৃহে পূজায় প্রবৃত্ত ছিলেন, এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে কে তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিল। হত্যাকারীকে কেহই ধরিতে সমর্থ হয় নাই। মহারাণী লক্ষ্মী দেবী গগন সিংহের হত্যার সংবাদ শুনিবামাত্র সেই রাত্রেই পদব্রজে ‘কোট’ নামক দরবারগৃহে উপনীত

হইলেন এবং রাজসভার সমুদায় পদস্থ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন; সকলে ত্বরায় উপস্থিত হইলেন। মহারাণীর আজ্ঞায় জঙ্গ বাহাদুরের সহায়তায় সে দিন ভীষণ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইল (১৯এ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬)। ফতে জঙ্গ, দলভঞ্জণ পাঁড়ে, অভিরাম রাণা, কনক বিক্রম শাহ প্রভৃতি ৩১ জন প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করা হইল। জঙ্গ বাহাদুর এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিনেতা ছিলেন। মহারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই হত্যাকাণ্ডে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের পর জঙ্গ বাহাদুর মহারাণী কর্ত্তৃক প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। মাতব্বর থাপার ন্যায় জঙ্গ বাহাদুরও মহারাণীর অভিসন্ধির সহিত যোগ দিতে পারিলেন না। মহারাণী লক্ষ্মী দেবী জঙ্গ বাহাদুরের দ্বারায় সুরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা করিবার জন্য শেষবারে চক্রান্ত করিলেন। চক্রান্তটী এইরূপ ছিল;—বীর ধোজ বুসনিয়াত এই চক্রান্তের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্থির হইয়াছিল যে, জঙ্গ বাহাদুর এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণকে কোট নামক গৃহে ডাকাইয়া আনিয়া হত্যা করা হইবে। বিজয় রাজ পণ্ডিত নামে এক ব্রাহ্মণ এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হইয়া জঙ্গ বাহাদুরকে বলিয়া দেন। জঙ্গ বাহাদুর অগ্রে জানিতে পারিয়া সাবধান হইলেন। বীর ধোজ ও ১৪।১৫ জন তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিকে হত্যা করা হইল। জঙ্গ বাহাদুর এবং তাঁহার বংশ-

ধরগণ "রাণাজু" এই উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এই চক্রান্তের পর লক্ষ্মী দেবী তাঁহার পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে কাশীতে চিরনির্ব্বাসিত হইলেন। মহারাণীর প্ররোচনায় মহারাজাধিরাজও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। এবং কিছুকাল কাশীধামে বাস করিয়া অনেক চক্রান্ত করিলেন। অবশেষে একদল বিদ্রোহীদলের সহিত যোগ দিয়া নেপালে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অচিরে পরাস্থ এবং বন্দী হইয়া কাটমণ্ডুতে নীত হন। তাঁহার অনুপস্থিতে সুরেন্দ্র বিক্রম সাহ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নেপালের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র. বিক্রম সাহ এক প্রকার বন্দী অবস্থায় জীবনের অবশিষ্ট দিন ভাটগাঁওএর রাজপ্রাসাদে যাপন করিয়াছিলেন। জঙ্গ বাহাদুরের সহায়তায় **সুরেন্দ্র বিক্রম সাহ** সিংহাসনারোহণ করিলেন এবং জঙ্গ বাহাদুর দ্বারাই নেপালের রাজবংশের ক্ষমতা চিরদিনের মত খর্ব্বীকৃত হইল। তখন হইতে রাজার ক্ষমতা লোপ পাইয়া মন্ত্রীর প্রাধান্য প্রবর্ত্তিত হইল। সেই সময় হইতেই নেপালের রাজমন্ত্রীই নেপালরাজ্যের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইলেন।

রাজাধিরাজ সুরেন্দ্র বিক্রম সাহ এই প্রকার ভাবে রাজত্ব করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না এবং একবার সিংহাসন ত্যাগ করিবার ইচ্ছাও করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃঃ সুরেন্দ্র বিক্রমের জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মগ্রহন করেন। ১৮৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজাধিরাজের আর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ১৮৪৮ খৃঃ ইংরাজগণ দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। তখন জঙ্গ বাহাদুর একদল গোর্খা

সৈন্য লইয়া ইংরাজদিগের সহায়তা করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেলকে প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজগণ জঙ্গ বাহাদুরের সৈন্যদলের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখ্‌দিগের মহারাণী চান্দা কঁয়াড় চুণার দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নেপাল সরকার তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন এবং মাসে ৮০০ টাকা ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে নেপালে এক প্রকার বন্দীর ন্যায় রাখা হইয়াছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতে তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা বনবাহাদুর প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তিনি জাতিচ্যুত হইয়াছেন এই বলিয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য এক চক্রান্ত হয়, তাঁহাকে জঙ্গ বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বদ্রিনুর সিং, তাঁহার পিতৃব্যপুত্র জয় বাহাদুর, রাজাধিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র বিক্রম সাহ যোগ দিয়াছিলেন। কাজি করবার ক্ষত্রি জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে ইংলণ্ড গিয়াছিলেন, তিনি জঙ্গ বাহাদুরের জাতিচ্যুত হইবার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। বনবাহাদুর এ চক্রান্তের বিষয় অবগত হইয়া জঙ্গ বাহাদুরকে অশ্রুপূর্ণলোচনে এসকল জ্ঞাত করেন। প্রথমে চক্রান্তকারীদিগকে হত্যা করিবার কথা হয়। পরে তাহাদের চক্ষু নষ্ট করিবার প্রস্তাব হয়। শেষে জঙ্গবাহাদুরের অনুরোধে ব্রিটীশ্ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে এলাহাবাদে বন্দী স্বরূপ রাখিয়াছিলেন।

জঙ্গ বাহাদুর

জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অশেষ প্রকারে নেপালের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইলেন। তিনি শাসন বিভাগে অনেক প্রকার সংস্কার আনয়ন করেন। পূর্ব্বে চৌর্য্যঅপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে নানা প্রকার নিষ্ঠুর উপায়ে অপরাধ স্বীকার করান হইত। হস্ত পদ নাসা প্রভৃতি কর্ত্তন করিয়া অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হইত। জঙ্গবাহাদুর এ সকল শাস্তির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রহিত করিয়া দেন। নেপালে সহমরণ প্রথাও এই সময় নিষিদ্ধ হয়। সুরেন্দ্র বিক্রমের পুত্র শাহাজাদা ত্রৈলোক্য বিক্রমের সহিত আপনার তিনটি কন্যার বিবাহ দেন। পৃথ্বী-বীর বিক্রমশাহ তাঁহার মধ্যমা কন্যার গর্ভজাত ছিলেন। সুরেন্দ্র বিক্রমের জীবদ্দশায়ই ত্রৈলোক্য বিক্রম পরলোকগমন করেন। জঙ্গবাহাদুর চিরদিনই ভারতের ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। ইংলণ্ড গমনের পর ব্রিটীশ রাজ্যের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা আরও ঘণীভূত হয়। কাটমণ্ডুর ব্রিটীশ রেসিডেণ্টের সহিত তিনি সর্ব্বদাই সদ্ভাবে যাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক জঙ্গবাহাদুর একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাহসী উদ্‌যোগী পরিশ্রমী পুরুষ বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ! এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে কেহ তাঁহার চক্ষে কখন জল দেখে নাই। তাঁহার আজ্ঞা তিলমাত্র অবহেলা করে এমন সাহস কাহারও ছিল না। অসমসাহসিক যে কোন কার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। বনের বাঘ, দুরন্ত বন্যহস্তী বশীভূত করা তাঁহার নিকট অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার ছিল।

কতদিন আমোদচ্ছলে ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কাটমণ্ডুর ইংরাজ চিকিৎসকদিগের পুস্তকে পাঠ করিয়াছি তিনি কঠিন অস্ত্রচিকিৎসা দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক হইতেন। ইংরাজ জাতি সাহসী বীরকে অত্যন্ত ভালবাসে, সেইজন্য জঙ্গবাহাদুরকে ইংরাজেরা অত্যন্ত সম্মান করিতেন। শিথিলভাবে কোন কার্য্য সম্পন্ন করা জঙ্গবাহাদুরের প্রকৃতি ছিল না। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ভিতর তাঁহার ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিত। নেপালের ইতিহাসে জঙ্গবাহাদুরের নাম চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে সংশয় নাই। একবার একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট নেপালে ভাল পথ নির্ম্মান করাইবার জন্য জঙ্গবাহাদুরকে অনুরোধ করেন, তাহার উত্তরে তিনি যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা নেপালীদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আছে, বলিয়াছিলেন "সাধে কি আমরা ভাল পথ করি না,—আমাদের রাজ্যের দুর্গমতাই আমাদের আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ রাজ্যের তুলনায় আমরা সিংহের সম্মুখীন বিড়াল। সিংহ আক্রমণ করিলে বিড়ালের আর কি সাধ্য আছে? তবে আত্মরক্ষার জন্য তাহার চক্ষু উপড়াইতে পারে।"

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জঙ্গবাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণদীপ সিংহ প্রধান রাজমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ধীরশামসের প্রধান সেনাপতি হইলেন। রণদীপ সিংহ মন্ত্রিপদাভিষিক্ত হইবার কিছুদিন পর সুরেন্দ্র বিক্রমের মৃত্যু হইলে তাঁহার পৌত্র

রাজকুমারী ও রাজমাতা শ্রীপাঁচ মহারাণী — রণদীপ সিংহ তাঁহার পত্নী

পৃথ্বীবীর বিক্রমশাহ নেপালের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রণদীপ সিংহ অতি ধর্ম্মপ্রাণ নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন, শুনা যায় তিনি শিশু মহারাজ অধিরাজকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। নেপালের মন্ত্রীপদ লইয়া চিরদিন যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া আসিতেছে। রণদীপ সিংহ যখন মন্ত্রীপদে সমারূঢ়, তখন ভিতরে ভিতরে মন্ত্রীপদ লইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের ভিতর নানা গুপ্ত চক্রান্ত চলিতেছিল। জঙ্গবাহাদুরের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে রণদীপ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধীরশামসেরের রাজমন্ত্রী হইবার কথা; কিন্তু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রণদীপ সিংহের জীবদ্দশায় তাহার মৃত্যু হইল। তখন জঙ্গবাহাদুরের পুত্রগণের এবং ধীরশামসেরের পুত্রগণের ভিতর মন্ত্রীপদ লইয়া প্রতিদ্বন্দিতা দাঁড়াইল। ধীরশামসেরের জ্যেষ্ঠপুত্র বীরশামসের কিছুদিন কলিকাতার ডবটন কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চতুর বক্তি ছিলেন; তাঁহাদের ভিতরে ভিতরে নানা গুপ্ত চক্রান্ত চলিতে লাগিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২২এ নবেম্বর রবিবার এই গুপ্ত চক্রান্ত অতি ভীষণভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িল;—সেদিন রণদীপ সিংহ রাজবাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন; সহসা বীরশামসের প্রমুখ তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রগণ উপস্থিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিল। কথিত আছে সেই সময়ে তিনি ইষ্টদেবতার পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন। বিদ্রোহীদল রণদীপকে হত্যা করিয়া জঙ্গবাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎজঙ্গকে এবং জঙ্গবাহাদুরের পৌত্র যুদ্ধ প্রতাপ জঙ্গকে হত্যা করিল। জঙ্গবাহাদুরের পদ্মজঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য পুত্রগণ

এবং রণদীপের একমাত্র পুত্র ধোজনরসিং এবং রণদীপের দলস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন ; নচেৎ সেদিন আরও অনেকের জীবন নাশ হইত। এই হত্যাকাণ্ডের পরই বীরশামসের আপনাকে প্রধান মন্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি রাজমন্ত্রী হইয়া যথা নিয়মে রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনি কাটমণ্ডু সহরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। জলের কল ও ড্রেন নির্ম্মান করিয়া বীরহাঁসপাতাল, বীরলাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রজাদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে বীরশামসেরের মৃত্যু হয় ; তাঁহার মৃত্যুর পর যথা নিয়মে দেবশামসের রাজমন্ত্রী হইলেন। কিন্তু দুই মাস মাত্র তিনি উক্তপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। দুই মাসের মধ্যেই মহারাজ চন্দ্রশামসের প্রমুখ দল তাঁহাকে নানাবিধ চক্রান্ত দ্বারা পদচ্যুত করিয়া একেবারে নেপালরাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। এখন তিনি ভারতবর্ষেই আছেন, তাঁহার নিজের ধনসম্পত্তি অধিকাংশই তিনি উপভোগ করিতেছেন। দেবশামসের পদচ্যুত হইয়াছেন বটে কিন্তু অন্য কোন প্রকারে তাঁহাকে ক্লেশ দেওয়া হয় নাই। নেপালের ইতিহাসে এই একমাত্র রক্তপাতশূন্য বিপ্লবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই ঘটনায় মহারাজ চন্দ্রশামসেরের বুদ্ধি এবং বিবেচনার যথেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। নেপালের রাজমন্ত্রীর পদ লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাত প্রভৃতি চিরন্তন রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহারাজ দেবশামসেরকে পদচ্যুত করিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ

বীরসামসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর

চন্দ্রশামসের রাজমন্ত্রী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে নেপালরাজ্যে ইনিও যে সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যোগ্যতম পুরুষ, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই একটী মাত্র ব্যক্তির উপর নেপালের আপামর সাধারণ লোকের সুখ দুঃখ নির্ভর করে; এই একটি মাত্র ব্যক্তির দ্বারা নেপালরাজ্যের সর্ব্ববিধ কল্যান সাধিত হইতে পারে;—এই একটী মাত্র ব্যক্তি ১০ বৎসরে নেপালের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন তাহা ভারতে কুত্রাপি আর সম্ভব নয়—নেপাল স্বাধীন রাজ্য! আশার চিত্র যাহা তাহা আজও দৃশ্যতঃ এবং কার্য্যতঃ সুব্যক্ত হয় নাই। নেপাল এতাবৎকাল কেবল ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থাভিসন্ধিতে নানা বিদ্রোহের লীলাভূমি হইয়াছে; যাহা হইতে পারে তাহা হয় নাই। মহারাজ চন্দ্রশামসের কাঠমণ্ডুর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর আছেন এখন কাটমণ্ডু সহর বৈদ্যুতিক আলোকে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এইরূপে অল্পাধিক পরিমাণে নেপালের সর্ব্বত্রই বাহ্যিক শ্রীবৃদ্ধি কিছু কিছু সাধিত হই.তছে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রজাগণ ইংরাজরাজ্যে যে সকল সুখ সুবিধায় বাস করিতেছে নেপালে তাহার কিছুই নাই। ভারতের সনাতন অবস্থা কিরূপ ছিল. তাহা যদি কাহার দেখিবার সাধ থাকে ত নেপালরাজ্যে গমন করিলে হয়। গাড়ী নাই (নেপাল উপত্যকায় রাজপরিবারের আছে)—রেল নাই—ত্বরিত ডাক নাই—টেলিগ্রাম নাই—ভাল স্কুল নাই—কলেজ নাই—বালিকাবিদ্যালয় নাই—রীতিমত আদালত নাই। আছে শ্রমজীবী কৃষক, আছে ভারবাহী মনুষ্য

এবং পশু, আছে সুলভ যোদ্ধা এবং সৈনিক, আছে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী রাণাপরিবার। যে জঙ্গবাহাদুর নেপালের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ, হত এবং নেপাল হইতে তাড়িত হইলেও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বর্ত্তমান সময়ে নেপালের সমুদয় উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী জঙ্গবাহাদুরেরই ভ্রাতুষ্পুত্র; নেপালেএই রাণাপরিবারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। নেপালরাজ পৃথ্বীবীর বিক্রম বিগত ডিসেম্বর মাসে (যখন পঞ্চমজর্জ্জ ভারতে শুভাগমন করেন) পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে নেপালের সিংহাসনে পৃথ্বীবীর বিক্রমের পঞ্চবর্ষীয় শিশুপুত্র ত্রিভূবন বিক্রমশাহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। নেপালের ভাগ্যে আবহমান কাল এইরূপ হইয়া আসিতেছে। পৃথ্বীনারায়ণের সময় হইতে (একজন ভিন্ন) শিশু নৃপতি দ্বারা রাজপদ শোভিত হইয়া আসিতেছে। নেপালে রাজার কোন কর্ত্তৃত্বই নাই;—সুতরাং সেখানে শিশুনৃপতিদ্বারা কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।

বৎসরাধিক কাল হইল মহারাজ চন্দ্রশামসের ইংলণ্ড ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। জঙ্গবাহাদুরের ইংলণ্ডে ভ্রমণ নেপালের ইতিহাসে অনেক শুভপরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। বর্ত্তমান রাজমন্ত্রীর বিলাত ভ্রমণের ফল এত অল্পকালের মধ্যে আমরা সমুদায় নির্ণয় করিতে পারি না। সম্ভবতঃ ইহার সুফলও নেপালের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে। নেপালের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে কি আছে জানি না; সেই বিচিত্র কর্ম্মা পুরুষের অপূর্ব্ব লীলা

নির্ণয় করে সাধ্য কার? বোধিসত্ত্বের এক তরবারির আঘাতে নাগবাস হ্রদ আজ রমণীয় উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে; না জানি আবার কোন মহাত্মার তরবারির আঘাতে নেপালের সমুদায় কুরীতি পাপরাশি ধৌত হইয়া নেপাল ভূপৃষ্ঠে স্বর্গধাম বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। নেপালের আভ্যন্তরীণ আর কোন কুরীতির কথাই উল্লেখ করিতে চাই না—কেবল দাসত্ব প্রথা আর বহু পত্নীগ্রহণের রীতি, আমার নিকট জাতীয় অবনতির মূল কারণ বলিয়া বোধ হইয়াছে। শুনিতেছি বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী অল্পে অল্পে এই উভয় প্রকার কুরীতি বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। নেপালের জনসাধারণের ভিতর শিক্ষার আলোক তেমন ভাবে বিস্তৃত হয় নাই। উচ্চপরিবারের রমণীগণ নিরক্ষর নহেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পুরুষগণ সামান্য ইংরাজি শিক্ষা করেন। কয়েকজন নেপালী যুবককে রাজমন্ত্রী শিক্ষার জন্য জাপানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের যেমন জীবিকার জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয় নেপালে তাহা নয়, সুতরাং সেখানে শিক্ষার অবস্থাও তদ্রূপ। নেপালে কর্ম্মচ্ছলে অনেক বাঙ্গালী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা ডাক্তার কেহ বা শিক্ষক। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার নামে একব্যক্তি বহুকাল হইতে নেপাল রাজসরকারে বন্দুক কামান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছেন। বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালির অপ্রতিহত গতি সর্ব্বত্র!

নেপাল রাজ্যে পদার্পন করিয়া, একদিন এই বলিয়া আনন্দ করিয়াছিলাম, যে আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন বায়ু আসিয়া

আমার দেহকে আলিঙ্গন করিল। এমন দিন আমার জীবনে আসিবে ভাবি নাই ত? তুই বৎসর নেপালে বাস করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে হইল, এযে আমার স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন। স্বাধীনতায় এ জাতি কি লাভ করিয়াছে হায়! আমি তাহা দেখিতে পাইলাম না!

নেপালের ব্রিটীশ রেসিডেণ্ট।

নেপালের বর্ত্তমান ইতিহাসের কথা বলিতে গিয়া কাটমণ্ডুর ব্রিটীশ রেসিডেণ্টের কথা উল্লেখ না করিলে কাহিণী অসম্পূর্ণ থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিরাছি পৃথ্বীনারায়ণের নেপাল জয়ের পূর্ব্ব হইতে কাটমণ্ডুর মল্লবাজার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যজাত সম্বন্ধ ছিল। সেই সূত্রে পৃথ্বী-নারায়ণ নেপাল আক্রমণ করিলে তাঁহারা ইংরাজের সহায়তা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধ এবং গুর্খা কর্তৃক নেপাল জয় প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। ক্যাপটেন নক্স কাটমণ্ডুতে গিয়া নেপালরাজের সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রথমে নেপালীরা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিত। শিখদিগের সহিত যুদ্ধের সময়, আফগানিস্থানের দুর্ঘটনায় তাহারা অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের পর নেপালী-দিগের চৈতন্যের উদয় হয়। ভীমসেন থাপাই একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বজাতিকে বুঝাইয়া বলেন, যে স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায় ইংরাজের সহিত কোন প্রকার সংঘর্ষণ উপস্থিত না করা।

কাটমণ্ডুতে যে ইংরাজ রেসিডেণ্ট বাস করেন তিনি নেপাল-রাজ্যের আভ্যন্তরীন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কাটমণ্ডু বাসকালে তাঁহার গতিবিধি সমুদায় রাজমন্ত্রী নিয়মিত করিয়া দিয়াছেন। রেসিডেণ্টের সহিত সকল রাজমন্ত্রী বন্ধুতা রক্ষা করিয়া চলেন বলিয়া রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। এই সর্ত্ত হেতু ইংরাজ রেসিডেণ্টের চক্ষের সমক্ষে নেপালে কতবার কত বিপ্লব কত হত্যাকাণ্ড, সংঘটিত হইল? এতাবৎকাল নেপালে অনেক সুবিখ্যাত ব্যক্তি রেসিডে-ণ্টের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সুবিখ্যাত হডসন সাহেব একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর কাল কাটমণ্ডুতে বাস করিয়া নেপালের পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। তিনি এই কার্য্যে কত যে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। নেপালের চতুর্দ্দিক হইতে অর্থব্যয় করিয়া কত শত শত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আজও তাহা লণ্ডনে সযত্নে রক্ষিত আছে। রেসিডেণ্টের সঙ্গে একজন ইংরাজ চিকিৎসক কাটমণ্ডুতে থাকেন। ডাক্তার রাইট (Wright) ডাক্তার ওলড্ ফিল্ড (Old Field) কত যত্ন পূর্ব্বক নেপাল সম্বন্ধে কত ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাঁদিগেরই পুস্তক হইতে নেপাল ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল গুণ ইঁহাদের জাতীয় মহত্ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কাট-মণ্ডুর বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট মেজর ম্যানার স্মিথ্ (Major Manner Smith) অতি উপযুক্ত ব্যক্তি। নেপালের চতুর্দ্দিকেই এখন

শান্তি এবং সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যাইতেছে। নেপালের ভূতপূর্ব্ব রাজাধিরাজ পৃথ্বীবীর বিক্রম এবং বর্ত্তমান শিশু নৃপতি ত্রিভুবন বিক্রমশাহের প্রতিমূর্ত্তি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। এই শিশু নেপাল রাজের দীর্ঘজীবন এবং নেপালের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যান কামনা করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করি।

নেপালের আদর্শ সতী স্বর্গীয়া বড় মহারাণী।

(মহারাজ চন্দ্র শামসের জঙ্গরাণা বাহাদুরের স্বর্গীয়া পত্নী)

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে নেপাল রাজ্যের ভাগ্যচক্র ইহার প্রধান মন্ত্রীই নিয়মিত করিয়া থাকেন। এক সময়ে মারাঠা প্রধান মন্ত্রী পেশোয়াগণ যেরূপ ক্ষমতা ধারণ করিতেন, বর্ত্তমান নেপালরাজমন্ত্রীদিগের ঠিক সেই গৌরব এবং সেইরূপ ক্ষমতা। রাজমন্ত্রী চন্দ্র শামসের জঙ্গরাণা বাহাদুর বর্ত্তমান সময়ে নেপালের ভাগ্যচক্র বিবর্ত্তন করিতেছেন। এই পদের গৌরব ও দায়িত্ব অনেক। পার্থিব দিক হইতে ইনি অতি ভাগ্যবান ক্ষণজন্মা পুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সুলভ হইলেও একদিকে দুর্লভ গার্হস্থ্য সৌভাগ্যেও ইনি ভাগ্যবান। বিধাতা ইহাকে অশেষ গুণ সম্পন্না লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভাগ্যবতী পত্নীদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যদিও ইনি অসময়ে তাঁহাকে হারাইয়াছেন, তথাপি তিনি যে সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভারতেশ্বরী স্বর্গীয়া সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অমৃতময় দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা করিতে করিতে লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন এইরূপ গুণসম্পন্না পত্নী দীন দরিদ্রে লাভ করিলেও ভাগ্যবান হয়, ভিক্টোরিয়ার পতি এলবার্ট কি ভাগ্যবান পুরুষ যে এমন পত্নী-রত্ন তিনি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা মহারাজ চন্দ্র শামসের রাণা বাহাদুরের গুণবতী পত্নীরত্ন সম্বন্ধেও

সেই কথা বলিতে পারি। এইরূপ পতিপ্রাণা নারী দরিদ্রের কুটীরে অতুল শোভা বিস্তার করে, রাজগৃহে কি কথা? এই মহীয়সী সৌভাগ্যশালিনী অশেষ গুণসম্পন্না মহিলার জীবন রমণী-কুলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া আমরা সাধারণের নিকট এই মোহন চিত্র উপস্থিত করিতেছি। হিন্দু রমণীর ধমনীতে আজও সীতা সাবিত্রীর পবিত্র শোণিত কিরূপে প্রবাহিত হইতেছে তাহা পাঠক পাঠিকা একবার দর্শন করুন।

মহারাজ চন্দ্র শামসের রাণা বাহাদুর সুবিখ্যাত জঙ্গরাণা বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র—তিব্বতের যুদ্ধে প্রসিদ্ধ বীর ধীরশামসেরের পুত্র। বর্ত্তমান সময়ে এই রাণা বংশই নেপালের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আমরা যাঁহার কথা বলিতে যাইতেছি তিনি মহারাজ চন্দ্র শামসের রাণা বাহাদুরের একমাত্র মহিষী ছিলেন। নেপালে বহু পত্নী গ্রহনের রীতি প্রচলিত আছে কিন্তু মহারাজ চন্দ্র শামসের রাণা বাহাদুর বোধ হয় ইহার এক মাত্র ব্যতিক্রম স্থল। তাঁহার গুণবতী পত্নী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পতির হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন, যে দিন তাঁহাকে সমুদয় নেপালের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী রমণী বলিয়া দর্শন করিতে যাই সে দিন তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি—"আমি সমুদয় নেপালের মধ্যে সৌভাগ্যবতী রমণী সন্দেহ নাই, কারণ বিধাতা যে শুধু আমাকে এমন পতি দিয়াছেন তাহা নহে, আমি আমার পতির একমাত্র মহিষী,—এ সৌভাগ্য আমার অন্য স্বদেশীয়া ভগিনীগণের নাই,—কন্যা অপেক্ষা পুত্রেরই এদেশে অধিক সমাদর, বিধাতা আমাকে

পাঁচটী পুত্র ও একটীমাত্র কন্যা দিয়াছেন। শোক তাপ আমি কিছুই পাই নাই, দেহ ভগ্ন হইয়াছে বটে কিন্তু পূর্ণ সুখ বিধাতা নরভাগ্যে রাখেন নাই, আমি ইহাতেই অত্যন্ত সুখী।” কি সুন্দর কথা! কেমন পূর্ণ সন্তোষ!

এই ভাগ্যবতী রমণী কাঠমুণ্ড সহরের ১৬০ ক্রোশ দূরে পাটান নামক স্থানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ রবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি সদ্বংশজাতা, শৈশবেই ইঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই ইঁহার প্রথমা কন্যা বজঙ্গী মহারাণী ভূমিষ্ঠ হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহন শামসের জঙ্গ রাণ বাহাদুর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার ভূমিষ্ঠ হন। তৎপরে ক্রমে তাঁহার আরও চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মের পর হইতেই তিনি নিদারুণ যক্ষারোগে শয্যাগত হন এবং প্রায় ৩ বৎসর ধীরতা এবং সহিষ্ণুতার সহিত অশেষ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু রমণীর জীবনে বর্ণনীয় বিশেষঘটনা প্রায় থাকেনা; ইঁহার জীবনেও উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা তেমন কিছু নাই। ইনি অতি ধর্ম্মপ্রাণা নিষ্ঠাবতী স্ত্রীলোক ছিলেন। রাজপতির সমভিব্যাহারে হরিদ্বার, বদরিকা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ প্রভৃতি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অনেক যাগ-যজ্ঞ, লক্ষ হোম, কোটী-হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দৈনিক জীবনে অতি নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতেন। রোগ শয্যায় পড়িয়াও এক দিনের তরে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত

প্রত্যুষে চারিটার সময় উঠিয়া প্রাতঃকৃত ও পূজা সমাপন করিয়া তবে ঔষধ সেবন করিতেন।

মহারাণী সকল বিষয়ে আদর্শ পত্নী ছিলেন। তিনি কিরূপ প্রাণ মন দিয়া একান্ত চিত্তে পতির হিত সাধন ও সেবা শুশ্রূষা করিতেন, যাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। নেপালের রমণীগণ স্বামীর পদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, তাহাত তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল, যতদিন তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, ততদিন নিয়ত স্বামীর সেবা করিয়াছেন। রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি যে ভাবে স্বামীর সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার আহার নিদ্রার কোন অনিয়ম ও কোন ব্যাঘাত যাহাতে না হয় সর্ব্বদা সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। স্বামী যথাসময়ে নিদ্রিত হইয়াছেন কিনা দাসীকে পাঠাইয়া তাহার তত্ত্ব লইতেন। অসুস্থ শরীরে শুইয়াও স্বামীর আহারের তত্ত্বাবধান করিতেন। পতির আরাম, পতির কল্যাণ তাঁহার হৃদয়ের নিত্য চিন্তার বিষয় ছিল। হিন্দু রমণী সাধারণতঃ পতিপ্রাণা, কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে পরাকাষ্ঠা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহারাণী যেরূপ সাধ্বী ও পতিপ্রাণা ছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য রাজপতিও তেমনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রেমের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পত্নীর জন্য যাহা করিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্তও অতি বিরল। বিধাতা তাঁহার গুণবতী পত্নীকে অতি উচ্চ প্রকৃতি ও প্রখর মেধা দিয়া এ জগতে পাঠাইয়াছিলেন সত্য,

কিন্তু মহারাজ তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক সুশিক্ষা দিয়া তাঁহার প্রকৃতি ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য আরো ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। মহারাজ তিন বৎসরকাল যেরূপ ভাবে মহারাণীর সেবা এবং চিকিৎসা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পত্নীর প্রতি গভীর প্রেম সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পত্নীর জন্য এই দীর্ঘকাল সকল প্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিয়ত মানসিক দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতেন। দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহার কোমল দেহকে ক্ষীণ করিতেছে দেখিয়া মহারাজ আকুল হইয়া পড়িতেন। মানবের সাধ্যে যাহা কিছু আছে পত্নীর জীবনের জন্য তাহার কিছুই অচেষ্টিত রাখেন নাই। যেদিন মহারাণীর রোগের কোনরূপ বৃদ্ধি হইত, চিকিৎসকদিগের প্রাণ ভয়ে শুকাইয়া যাইত, মহারাজ হয়ত ভাবিবেন কোন ত্রুটি, কোন অনিয়ম হইয়াছে। স্ত্রীর রোগ যন্ত্রনা ও শীর্ণ দেহলতা দেখিয়া মহারাজ শোকে কাতর হইতেন। যে প্রাণ বিশাল রাজ্যের ভার বহন করিতে পারে, যাহা বিপদে অচল অটল, তাহা পত্নীর রোগশয্যা পার্শ্বে স্থির থাকিতে পারিত না।

ইঁহাদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল, উভয়ের প্রতি উভয়ের গভীর প্রেম ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে প্রতিহত করিতে পারে? এই সুদৃঢ় প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মৃত্যু রাজভবনকে শোকে আচ্ছন্ন করিল, মহারাজের সুখের সংসার অকালে অন্ধকার হইল। মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে পশুপতিনাথে লইয়া যাওয়া হয়। সেদিন রাত্রি দশ-

টার সময় মহারাজকে অনুরোধ করিয়া গৃহে পাঠাইলেন, রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার শেষ সময় উপস্থিত হইল। ভগিনীকে পতির প্রতিকৃতি আনিতে অনুরোধ করিলেন, একবার একদৃষ্টে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন, তারপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। চিতাভস্ম বাঘমতীর জলে মিশ্রিত হইল, ধীর গম্ভীর নিনাদে কামান ধ্বনিত হইয়া এই নিদারুণ বার্ত্তা সহরবাসীকে জ্ঞাপন করিল, কত চক্ষে সেদিন বারিধারা বর্ষিত হইল কে গণনা করে ?

একটী ঘটনা বলিলে নারীগণ মহারাণীর পতিভক্তি বুঝিতে পারিবেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই মহারাণী পতিকে বিবাহ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন। "আপনি বিবাহ করুণ, আমি চক্ষে তাহাকে দেখিয়া যাই, আমি তাহাকে আপনার সেবার সকল ব্যবস্থা শিখাইয়া দিয়া যাই। আমি সকল বন্দোবস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাই।" শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি বার বার পতিকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। "আপনি যদি আমার জন্য শোকার্ত্ত হৃদয়ে কাল যাপন করেন, আমার আত্মা নরকগামী হইবে, আমি পরকালের সুখে বঞ্চিত হইব। ইহকালে আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, মৃত্যুর পরে যেন আর কষ্ট না দিই"। এই উক্তি নারীর পক্ষে কি কঠিন, কত গভীর প্রেম হৃদয়ে থাকিলে পত্নী পতিকে এরূপ অনুরোধ করিতে পারেন? কত

স্ত্রীলোক সপত্নী ভয়ে কাতর হইয়া মৃত্যুশয্যায় পতিকে আবার বিবাহ করিতে নিষেধ করে! কয়জন নারী আছেন যিনি প্রাণ খুলিয়া স্বামীকে এইরূপ অনুরোধ করিতে পারেন? মৃত্যুর পূর্ব্বে একদিন তিনি কন্যাকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার পিতাকে কেবল কষ্টই দিলাম। যদি তোমার পিতা আবার বিবাহ করেন, তাঁহাকে সম্মান করিও, আদর করিও। তিনি তোমার গুণবতী মাতা হইবেন, তিনি তোমাদের শূন্য গৃহ পূর্ণ করিবেন, তোমার শোকার্ত্ত পিতার অন্তরে শান্তি দিবেন।"—আমরা কখন শুনি নাই কোন মাতা এরূপভাবে কন্যাকে কখনো উপদেশ দিয়াছেন।

মহারাণী আদর্শ মাতা ছিলেন, সন্তানদিগের সুশিক্ষার প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিতেন। একদিন শিশু পুত্রটী কি অন্যায় করিয়াছিল, তিনি শুনিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি কি পাপিনী, আমার গর্ভের সন্তান কেন এরূপ করিল?" শিশুর অপরাধ সকলেই তুচ্ছ করে কিন্তু তাঁহার নিকট শিশুর অপরাধ গুরুতর বোধ হইত। সন্তানেরা তাঁহাকে যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, তেমনি ভয় করিত, এমনি তাঁহার সুদৃঢ় শাসন ছিল। এই চরিত্রবতী রমণীর প্রাণে অতি আশ্চর্য্য সৎসাহস ও তেজস্বিতা ছিল। কোন প্রকার অন্যায়ের প্রশ্রয় তিনি দিতেন না।

মহারাণী প্রচুর দান ধ্যান করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা অসাধ্য। তুলা দান, সহস্র সহস্র গাভী দান, সুসজ্জিত গৃহ ও উদ্যান ব্রাহ্মণকে দান করিয়া গিয়াছেন। পতির নামে

দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া কত লোকের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন, কত অপরাধীর কারাবাস-দুঃখ মোচন করিয়াছেন। দেশের অর্থ অপহরণের অপরাধে দণ্ডিত জনৈক সুবাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া জল্লাদের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। হিন্দু শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মে পুণ্যসঞ্চয় হয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কিছুই তিনি অননুষ্ঠিত রাখেন নাই। রোগশয্যায় পড়িয়া শাস্ত্রকথা শ্রবণে তিনি কত সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মত নারী পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম-গ্রহণ করেন! তিনি এই বিশাল নেপাল রাজ্যের প্রধানা রমণী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও দূরাগত বিদেশী যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, তাঁহারাই তাঁহার সৌজন্য, দয়া, মিষ্ট-ভাষিতা প্রভৃতি গুণে মোহিত হইত। তিনি অতিশয় দূর-দর্শিনী বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন; তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য সুবুদ্ধি এবং সদ্বিবেচনার পরিচয় দিত। মহৎ প্রকৃতিই স্বীয় মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনার উচ্চ পদের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। শুধু পদের গৌরব রক্ষা কেন, তিনি স্বীয় পদের গৌরব বৃদ্ধিও করিয়া গিয়াছেন। এরূপ নারী-রত্ন শুধু এদেশের কেন, সমস্ত হিন্দুরমণীর গৌরবস্থল। সমগ্র নারীমণ্ডলী তাঁহার দৃষ্টান্তে পতিভক্তি, পতিসেবা, গুরুভক্তি, সন্তানের শিক্ষা, প্রজাপালন প্রভৃতি সকল গুণই শিক্ষা করিতে পারে।

এই দুর্ভেদ্য গিরি প্রদেশে, রাজান্তঃপুরে, নরচক্ষুর অগোচরে

নেপালরাজ মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীবীর বিক্রমশা

ও তৎপুত্র

বর্ত্তমান নরপতি মহাবাজাধিরাজ ত্রিভুবন বিক্রমশাহ

এমন রমণী-রত্ন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহার নাম স্মরণ করিলে হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভয়ে অবনত হয়! মহারাজ চন্দ্র শামসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর ভাগ্যবান পুরুষসিংহ, যিনি এমন রমণীরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ত অমর ধামে গমন করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যচরিত অমর হউক, তাহার পুণ্য সকলকে রক্ষা করুক।